পর্যায়—২

প্রশাসনিক তত্ত্বসমূহ

একক-১	☐	মানবিক সম্পর্কের দৃষ্টিভঙ্গি : এলটন মেয়ো, চেষ্টার বার্নার্ড ও মেরি পার্কার ফলেট
একক-২	☐	পরিচালনে আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি—হারবার্ট সাইমন
একক-৩	☐	উন্নয়ন প্রশাসন—ফ্রেড রিগ্‌স
একক-৪ (ক, খ)	☐	জনপছন্দ তত্ত্ব ও জননীতি বিশ্লেষণ

একক-১ ❑ মানবিক সম্পর্কের দৃষ্টিভঙ্গি : এলটন মেয়ো, চেষ্টার বার্নাড ও মেরি পার্কার ফলেট

গঠন

১.১ উদ্দেশ্য

১.২ মানবিক সম্পর্ক দৃষ্টিভঙ্গি পরিচিতি

১.৩ মানবিক সম্পর্কের উৎস সম্পর্কে ধারণা

১.৪ মানবিক সম্পর্ক দৃষ্টিভঙ্গির ধারণা

  ১.৪.১ এলটন মেয়ো

  ১.৪.২ চেষ্টার বার্নাড

  ১.৪.৩ মেরি পার্কার ফলেট

১.৫ উপসংহার

১.৬ সারাংশ

১.৭ নমুনা প্রশ্নাবলী

১.৮ তথ্যসূত্র

১.৯ নির্বাচিত পাঠ

১.১ উদ্দেশ্য

এই বিষয়ের উদ্দেশ্য একাধিক সংস্কৃতি, প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ এবং পরিচালনমূলক সংগঠনের সাথে জড়িত বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে ছাত্রদের অবহিত করানো। এই পাঠক্রমের লক্ষ্য হল একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মানুষের পরিচালনগত দিক সম্পর্কিত জ্ঞান প্রদান করা।

এই ইউনিট পড়ার পর ছাত্ররা :

- মানবিক সম্পর্ক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে ধারণাটি ব্যক্ত করতে সমর্থ হবেন,
- মানবিক সম্পর্ক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপ্তি নির্ধারণ করতে পারবেন
- মানবিক সম্পর্ক পদ্ধতি সম্পর্কে ইতিহাস বর্ণনা করতে সক্ষম হবেন এবং
- মানবিক সম্পর্ক দৃষ্টিভঙ্গির সীমাবদ্ধতা ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবেন এবং মানবিক সম্পর্ক দৃষ্টিভঙ্গির সীমাবদ্ধতা ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবেন।

১.২ মানবিক সম্পর্ক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচিতি

১৯২০-এর দশকে ঐতিহ্যগত পরিচালন বিষয়ক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে একটি পরিবর্তনের প্রবণতা পরিলক্ষিত

হয়। ঐতিহ্যগত পরিচালন তত্ত্বের তাত্ত্বিক ফ্রেডরিক টেলর, হেনরি গান্ট, ফ্রাঙ্ক এবং লিলিয়ান গিলবার্থ একটি নির্দিষ্ট কাজ কীভাবে সম্পন্ন করতে হবে, একজন কর্মচারী কার্য সম্পাদনে কী পদক্ষেপ নেবেন এবং একজন কর্মচারী বিভিন্ন পদ্ধতিতে কত সময়ের মধ্যে কার্য সম্পাদন করতে পারবেন তা নিয়ে গবেষণা করেছেন। এরপর একটি কার্য সমাপ্তির সবচেয়ে কার্যকর উপায় নির্ধারণ করতে এই তথ্য ব্যবহার করে তারা একটি সাধারণ তত্ত্ব নির্মাণের প্রচেষ্টা করেছেন।

১৯০০ থেকে ১৯৩০ পর্যন্ত টেলরের বৈজ্ঞানিক পরিচালন তত্ত্বের আধিপত্য ছিল। তিনি কর্মচারীদের সর্বাধিক উৎপাদনের দিকে আলোকপাত করেছেন। ঐতিহ্যগত পরিচালন তত্ত্বে সুনির্দিষ্ট কার্যপদ্ধতি এবং দক্ষতার সঙ্গে উৎপাদন কার্য সম্পাদনের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। এই তত্ত্বে কর্মচারীদের দক্ষতা ও কার্যক্ষমতার উপর গুরুত্ব দেওয়া হলেও তাদের মানসিক চাহিদার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিচালক কিংবা শ্রমিক কেউই খুশি ছিলেন না।

সমালোচকরা ঐতিহ্যবাহি পরিচালন তত্ত্ব আরও খুঁটিতে পড়তে শুরু করেন, এই তত্ত্বে কর্মীদের ওপর ক্ষতিকর প্রভাবগুলিকে আরও ভালোভাবে বুঝে নেওয়ার জন্য। কর্ম ও কর্মচারীদের সামঞ্জস্যের ওপর অধিক গুরুত্ব দেওয়াই মানসিক বিপ্লবের প্রধান কারণ হয়ে উঠেছিল বলে অনেক সমালোচকই মনে করতেন না, যা টেলর এবং তার সহকর্মীরা আশা করেছিলেন। পক্ষান্তরে এই সময় পরিচালকদের মধ্যে এমন একটি ধারণা তৈরি হয়েছিল যে কর্মীরা যন্ত্রের অনুসঙ্গ ছাড়া আর কিছু নয়। যন্ত্র এবং প্রক্রিয়ার মধ্যে সমতা আনা সম্ভব হলেও তাত্ত্বিকরা মনে করতেন আবেগগত বৈশিষ্ট্যের নিরিখে এই সমতা আনা সম্ভব নয়। ফলত যখন টেলর ও ঐতিহ্যবাহী পরিচালন তাত্ত্বিকরা সমতা আনার বিষয়ে তাদের গবেষণা চালাতে থাকেন, তখন অন্যান্যরা কর্মীদের আচরণ সম্পর্কে গবেষণা শুরু করেন এবং এইভাবে নয়া ঐতিহ্যবাহী পরিচালন তত্ত্বের শুরু হয়, যার প্রতি মানবিক সম্পর্কের দৃষ্টিকোণ আজও দায়বদ্ধ।

ধ্রুপদী দৃষ্টিকোণ সাধারণভাবে কর্মসংস্থানের উপর দৃষ্টিপাত করেছিল। অপরদিকে মানবিক সম্পর্কের দৃষ্টিকোণ প্রতিষ্ঠানের মানবিক দিকগুলির ওপর গুরুত্ব দিয়েছিল। একে নবঐতিহ্যবাহী ধারণা বলা হয় কারণ, প্রাথমিক পর্বের পরিচালন ব্যবস্থার ঐতিহ্যবাহী ধারণার সীমাবদ্ধতার প্রতিক্রিয়া হিসেবে এর জন্ম।

এই মানবিক সম্পর্কের আন্দোলন ১৯২৪ থেকে ১৯৩৩ সালে, ইলিনয় শহরে ওয়েস্টার্ন ইলেকট্রিক কোম্পানির হর্থন প্ল্যান্টে সংগঠিত বেশ কয়েকটি বিখ্যাত পরীক্ষা-নীরিক্ষার দ্বারা প্রেরণা পেয়েছে, যে পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলি হর্থন অধ্যয়ন নামে পরিচিত। যন্ত্র, উপকরণ ও বিমূর্ত প্রক্রিয়ার ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়ে মানবিক দিকগুলিকে অবহেলা করার প্রতিক্রিয়া হিসাবেই এটি বিকশিত হয়। এলটন মেয়ো মানবিক মতবাদের জনক হিসেবে আজ সর্বজনবিদিত। কর্মীদের প্রতিক্রিয়া এবং পারস্পরিক সমন্বয় ক্রিয়াকে আরও ভালোভাবে বুঝে নেওয়াই এই মতবাদের অন্যতম উদ্দেশ্য। মানবিক সম্পর্ক মতবাদ নিম্নলিখিত ছ'টি প্রস্তাবের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে থাকে।

- এই মতবাদ শুধুমাত্র যন্ত্র ও অর্থনীতির উৎপাদনশীলতার পরিবর্তে মানুষের উপর গুরুত্ব প্রদান করে থাকে,
- এই মতবাদ মনে করে যে, মানুষ একটি প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশে তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখে, কেবলমাত্র সংগঠিত প্রেক্ষাপটে নয়,

- মানবিক সম্পর্কের একটি অন্যতম কার্য হল অন্যকে প্রেরণা যোগানো,
- এই প্রেরণা দলবদ্ধভাবে কাজ করাকে উৎসাহ যোগায়, যা একে অপরের সাথে বোঝাপড়া এবং সমন্বয়সাধনের প্রক্রিয়াকে সহজ করে তোলে।
- মানবসম্পর্ক দলগতভাবে কাজের মাধ্যমে ব্যক্তিগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্যগুলিকে পরিপূর্ণ করে তোলে।
- এই মতবাদ মনে করে যে, ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান উভয়েই দক্ষতাকে এমন ভাবে ব্যবহারের কথা বলে থাকে, যাতে সবথেকে স্বল্প শ্রম দিয়ে সর্বাধিক লাভ অর্জন করা যায়।

ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই বলে মনে করে মানবিক সম্পর্ক মতবাদ ব্যক্তিসম্পর্ক এবং পারস্পরিক সমন্বয়ের বিষয়গুলিকেই অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। ব্যক্তির চাহিদা এবং আচরণকে নিরীক্ষণ করাই এর উদ্দেশ্য। প্রেরণার উন্মেষ ঘটানো এবং কাজের সন্তুষ্টিবিধান করাই এই মতবাদের মূল লক্ষ্য।

১.৩ মানবিক সম্পর্কের উৎস সম্পর্কে ধারণা

নব্য ধ্রুপদি তত্ত্বের ধারণা একটি প্রতিষ্ঠানের মানবীয় দিক সম্পর্কে দৃষ্টিপাত করে। এই তত্ত্ব চেষ্টা করে আচরণবাদকে পরিচালন তত্ত্বের মধ্যে অঙ্গীভূত করতে। এই নব্য ধ্রুপদি তত্ত্বের দুটি মূল উৎস রয়েছে—মানবীয় সম্পর্কের আন্দোলন ও আচরণবাদী আন্দোলন। সমাজবিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানীগণ মানবিক সম্পর্কের আন্দোলনের ক্ষেত্রে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করেছিল। মানুষ কীভাবে গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে এবং কীভাবে গোষ্ঠীর সাপেক্ষে তার অভিব্যক্তি প্রকাশ পায় মানবিক সম্পর্কের তাত্ত্বিকদের বক্তব্যে তা আলোচিত হয়। আচরণবাদী আন্দোলন এসেছিল মনোবিজ্ঞানীদের কাছ থেকে, যারা এর মধ্যে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিল প্রত্যেক কর্মীর স্বতন্ত্র আচরণের উপর। ঐ আন্দোলনে সমাজবিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানীরা প্রাধান্য বিস্তার করেছেন। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকগণ ওয়েস্টার্ন ইলেকট্রিক কোম্পানির হর্থন, সিসেরো, ইলিনয়-এর কর্মীদের কার্যক্রম ও উৎপাদন ক্ষমতার উপর গবেষণা চালিয়ে ছিলেন। সেই গবেষণাটি “Hawthorne effect” নামে পরিচিত। গবেষক দলটি ঐ কোম্পানির কুড়ি হাজারেরও বেশি কর্মীর ওপর, ১৯২৪ থেকে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত সমীক্ষা চালিয়েছিল। এই মানবীয় সম্পর্কের আন্দোলন ওয়েস্টার্ন ইলেকট্রিক হর্থন কোম্পানির উৎপাদন বৃদ্ধি করার উপায় বের করেছিল, যা এলটন মেয়ো, উইলিয়াম ডিক্সন, ফ্রিট্‌জ. জে. রোথলিসবার্জার প্রমুখের গবেষণাজাত ফল।

হাভার্ড গবেষকদের গবেষণার দৃষ্টিভঙ্গি কর্মীদের উৎপাদন ক্ষমতার চরিত্র সম্পর্কে স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতে পারেনি। এখানে সামাজিক চাপ কর্মীদের কর্মক্ষমতা প্রকাশের বাধা হয়ে দাঁড়ায়। হর্থন গবেষণা প্রকাশ করে যে, কর্মীদের সম্পর্কের মতো সামাজিক ঘটনাগুলি কর্মীদের উপর প্রভাব ফেলে; এই সম্পর্কে পরিচালককে গুরুত্ব দিতে হবে। পরিচালক কর্মীদের সামাজিক চাহিদা পূরণ করতে ব্যর্থ হলে কর্মীদের কর্মদক্ষতা নিম্নগামী হয়। কর্মীদের প্রয়োজন তাদের কাজ সম্পর্কে যথার্থ মূলবোধ অর্জন; যদি এটি অর্জন করতে না পারে তাহলে তাদের কাজটি যথার্থ বলে গ্রহণযোগ্য হয় না। কর্মচারী তাদের পূর্বতন সহকর্মীর কাজের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নির্দিষ্ট কাজ করলে কাজটি যথোপযুক্ত হয়। মানবীয় সম্পর্কের তাত্ত্বিকগণ বলেন যে কর্মীরা মাঝে মধ্যেই যদি তাদের কাজ সংক্রান্ত তথ্য ও জ্ঞান আদানপ্রদান করে তাহলে, তাদের সামাজিকীকরণের চাহিদা পূরণ হয় এবং তারা অধিক কর্মক্ষম হন।

গবেষকগণ এই গবেষণা প্রকল্পটি দাঁড় করিয়েছিলেন কর্মীদের কাজের সময়, অবসর সময় ও কাজের দৈর্ঘ্যের ভিত্তিতে; গবেষকরা কর্মীদের অংশগ্রহণকে খুব নিবিড়ভাবে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এই নিরীক্ষা চলাকালীন অংশগ্রহণকারীদের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

১.৪ মানবিক সম্পর্ক দৃষ্টিভঙ্গির ধারণা

এলটন মেয়ো ও তার সঙ্গীগণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হর্থন ইলেকট্রিক কোম্পানির উপর গবেষণা চালিয়েছেন ১৯২৪ থেকে ১৯৩২ সালের মধ্যবর্তী সময়ে। এই গবেষণা ক্ষেত্রে তারা ২০০০০ এরও বেশী কর্মচারীর উপর পরীক্ষা চালান এবং তাঁরা মানবিক সম্পর্ক দৃষ্টিভঙ্গির বহুবিধ প্রয়োগিক দিক আবিষ্কার করেন। গবেষকদের সাধারণ সিদ্ধান্ত ছিল এই যে, অযৌক্তিক বা আবেগপূর্ণ আচরণ অর্থনীতির সাথে সাথে অন্যান্য ক্ষেত্রেও কর্মীগোষ্ঠীর উপর প্রভাব ফেলতে পারে। তাদের মতের ভিত্তিগুলি নিম্নরূপ :

১। যে কোনো প্রতিষ্ঠানের কর্মী শুধুমাত্র আর্থিক লাভের দ্বারা তৃপ্ত হবে না, সেই সঙ্গে সামাজিক ও জৈবিক চাহিদা, অনুভূতি, অভিপ্সা বা আরো একাধিক বিষয়ের দ্বারা পরিতৃপ্ত হন।

২। বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান নিজে একটি সামাজিক ব্যবস্থা বা উপব্যবস্থা।

৩। প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শুধু আদেশ নয়, সহযোগী মনোভাব খুবই জরুরী। শুধুমাত্র আদেশমূলক আচরণ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে।

৪। পরিচালন গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য হলো কারিগরি দক্ষতার সাথে সাথে সামাজিক এবং নেতৃত্বের দক্ষতার বিকাশ ঘটানো।

৫। একটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নৈতিক উৎকর্ষতার ফল দ্রুত পাওয়া যায়।

এই দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের এবং তার কর্ম সংস্কৃতির পরিবেশ সম্পর্কে নতুন চিন্তার সুযোগ করে দিয়েছিল। একটি সামাজিক ব্যবস্থা হিসাবে সংগঠনকে দেখার অভিমুখ এই তত্ত্বের অবদান এবং মানুষ এখানে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে ভূমিকা নেয়। ব্যক্তিগত সম্পর্ক, নেতৃত্বের দক্ষতা, মানবীয় প্রেরণা ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ বিশ্লেষণ যেমন এই দৃষ্টিভঙ্গীর ধারকরা করে থাকেন, তেমনি এই দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্তি ও গোষ্ঠী সম্পর্কের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়।

এই তত্ত্বে একটি প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর আচরণে মানবিক ও সামাজিক ভূমিকা নিয়ে বিশ্লেষণ কম হয়েছে। প্রতিষ্ঠানে মানবিক মূল্যবোধের প্রাসঙ্গিকতার ওপর আলোকপাত করা হয়। শারীরিক ভিন্নতা ও উৎপাদনের মধ্যে যে কোনো সম্পর্ক নেই তা এই তত্ত্বের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছিল। এই তত্ত্ব অনুসারে উৎপাদন বাড়ানোর জন্য যে কোনো পরিবর্তনই তাৎপর্যহীন বলে মনে করা হয়। অন্য একটি নিরীক্ষা সংগঠিত হয়েছিল ব্যাঙ্ক ওয়্যারিং ঘরে, যেখানে থেকে এই সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় যে ব্যক্তিগত বেতন প্রদান গোষ্ঠী সম্পর্ককে উৎসাহ প্রদান করে। এটিও দেখা যায় যে ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব কিছু নিয়ম ও সীমাবদ্ধতা রয়েছে। হর্থন অধ্যয়ন গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠানের উপর বেশি জোর দেয়। হর্থন অধ্যয়ন এটি দেখায় যে প্রতিষ্ঠান হল এমন একটি সমাজ কাঠামো, যা আসলে গোষ্ঠী অধ্যয়ন ও গোষ্ঠী আচরণের সম্মিলিত রূপ। প্রথা ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তুলনা করে সামাজিক গোষ্ঠীকে লৌকিকতা বর্জিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। হাভার্ড গবেষকরা সিদ্ধান্ত করেন যে সহায়ক

পরিচালক উৎপাদন বৃদ্ধিতে উৎসাহ দেয়। মানবীয় সম্পর্কের তত্ত্ব এ কথা বলে যে গোষ্ঠীর নিয়ম ও একতার ফলে যদি প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সত্য হয় তাহলে প্রতিষ্ঠানটি অধিক উৎপাদনশীলতা সম্পর্কে আশাবাদী হতে পারে। কিন্তু সমালোচকরা সহমত যে যদি সহায়ক পরিচালক না থাকে তাহলে কার্যক্রম সম্বন্ধে ভীতির ফলে হতাশা আসে এবং সেক্ষেত্রে পরিচালকীয় নীতিকেই দায়ী বলে মনে করা যেতে পারে।

১.৪.১ জর্জ এলটন মেয়ো (১৮৮০-১৯৪৯)

জর্জ এলটন মেয়ো ছিলেন একজন অস্ট্রেলীয়ান মনোবিজ্ঞানী, শিল্প গবেষক ও সাংগঠনিক তাত্ত্বিক। ১৯৩০ সালে তাত্ত্বিক এলটন মেয়ো এবং তার সহযোগীরা শিকাগো ওয়েস্টার্ন ইলেকট্রনিক কোম্পানীর হথর্ন প্ল্যান্টে একটি গবেষণা চালায়। মেয়ো কর্মীদের উপর যে গবেষণা করেছিলেন তা ছিল অনুমানভিত্তিক। প্রাথমিক ভাবে দুটি দলকে গবেষণার জন্য নির্বাচিত করা হয় এবং এটি তার উৎপাদনশীলতার পরিবর্তনকে চিহ্নিত করে। এটিতে দেখা গিয়েছিল যে আলোর পরিবর্তন, এমন কি সেটি খারাপ করার পরেও তাদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। এ থেকে এই প্রাথমিক সিদ্ধান্তে আসা গিয়েছিল যে কাজের শর্তের পরিবর্তন তাদের উন্নতির পথে চালিত করে। কাজের শর্তের মধ্যে অন্যান্য ঐচ্ছিক শর্ত পরিবর্তন করে এটা দেখানো হয়েছিল যে কি করে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ভালো ফল পাওয়া যায়।

মেয়োর কাজ 'হথর্ন তত্ত্ব' নামে পরিচিতি লাভ করে। তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন যে কাজের একঘেঁয়েমি ও পুনরাবৃত্তি কাজের গতিতে মন্থর ভাবে পরিচালিত করে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে এই প্রেরণাকে বাড়ানো যায় যদি কর্মীদের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং তাদের চিন্তার স্বাধীনতা এবং তাদের সামাজিক প্রয়োজনীয়তা পূরণ করা যায়। মেয়োর মতে কাজের ক্ষেত্রে প্রেরণাকে গুরুত্ব দিতে হলে কতগুলি বিষয়ের উপর জোর দিতে হবে—

- বৃহত্তর যোগাযোগ
- ভালো দায়বদ্ধতা
- অন্যদের প্রতি আগ্রহ দেখানো
- সিদ্ধান্তের মধ্যে অন্যদের যুক্ত করা
- অন্যের কল্যাণ নিশ্চিত করা
- কাজকে আকর্ষণীয় করা ও পুনরাবৃত্তি রোধ করা

মেয়োর কাজ মানবিক সম্পর্ক আন্দোলনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করতে সহায়তা করেছিল। তিনি উৎসাহ প্রদান করে বলেন কর্মক্ষেত্রে প্রথাগত প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি ভালো একটি অনানুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানের অস্থিত্ব প্রয়োজন। মেয়ো শিল্পপ্রতিষ্ঠানে বৈজ্ঞানিক পরিচালন তত্ত্বকে চিহ্নিত করেছিলেন এবং দেখিয়েছিলেন ঐ ধরনের প্রতিষ্ঠানে যারা কাজ করে তাদের নিজেদের মধ্যে সম্পর্কের গুরুত্ব কতখানি। তাঁর এই ধারণা নিয়ে ১৯৩৩ সালে একটি পুস্তক প্রকাশিত হয়েছিল, যার নাম *The Human Problem of an Industrialized Civilization* এই বইটি আসলে হর্থন গবেষণার উপর ভিত্তি করে রচিত। তাঁর গবেষণার মূল বিষয় ছিল এই যে, ব্যক্তিকর্মী একক ভাবে সাফল্য পাবে না, যদি না তারা সমষ্টিবদ্ধ ভাবে কাজ করে। হথর্ন গবেষণার কয়েকটি মৌলিক ফলাফল ছিল নিম্নরূপ :

- গবেষণায় উপলব্ধ হয় যে, আর্থিক সাফল্য এবং ভালো কাজের পরিবেশ নির্ভর করে সমষ্টিবদ্ধ কাজের ওপরে।

- কর্মক্ষেত্রের মধ্যে অনানুষ্ঠানিক বা বেসরকারি গোষ্ঠী থাকলে সকল কর্মীদের কাজ করার উৎসাহ বৃদ্ধি পায়।

এটা দেখা যায় যে পরিচালক যদি শ্রমিকদের সামাজিক চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হয়, তাহলে কর্মচারীরা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে কাজ করবে, না হলে বিরুদ্ধাচরণ করবে।

এলটন মেয়ো প্রতিষ্ঠানে মানবিক উপাদানের ওপরে গুরুত্ব দেন। মেয়ো বলেন যে কর্মীদের সামাজিক চাহিদা ও আগ্রহ চিহ্নিত করা প্রয়োজন। তারা যেন টেলরের তত্ত্বের দ্বারা আর্থিকভাবে বঞ্চিত না হয়। মেয়োর তত্ত্ব এটা প্রমাণ করে যে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা যায় নিয়ন্ত্রিত কর্মী গোষ্ঠীর দ্বারা। কর্মীরা যদি ভাবে যে তারা এই প্রতিষ্ঠানের অঙ্গ, তাহলে তারা উৎসাহের সঙ্গে কাজ করবে বলে গবেষকরা উল্লেখ করেন। এই তত্ত্বের মাধ্যমে যেভাবে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করার উপর জোর দেওয়া হয় তা সমাজবিজ্ঞানের জগতে হথর্ন প্রভাব নামে পরিচিত।

ব্যাঙ্কের তারের ঘরে অন্য একটি গবেষণার আয়োজন করা হয়েছিল, যেখানে পুরুষ কর্মীদের একটি ছোট দল বৈদ্যুতিক উপাদান উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত ছিল। এই গবেষণা প্রমাণ করে যে কর্মীরা শুধুমাত্র আর্থিক বিবেচনার দ্বারা চালিত হয় না, যেটি প্রতিষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক দিক হিসেবে চিহ্নিত হলেও আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে, যাকে অনানুষ্ঠানিক দিক বলা যায়।

এই গবেষণা আবিষ্কার করে মানবিক উপাদানের গুরুত্ব এবং আরো একটি নতুন ক্ষেত্রের সূচনা করে যেটি কর্মীদের জ্ঞানের প্রয়োজনে সহায়তা করে। এই তত্ত্ব শ্রমিকদের অবসর সময়যাপন এবং ভালো জীবনযাপনের সহায়ক একটি পরিবেশের নক্সা তৈরি করে। এটি সত্য যে এই তত্ত্ব মানুষের সম্পর্কে তত্ত্বের উত্থানে এটি নূতন বৈজ্ঞানিক মনোবিজ্ঞানের তত্ত্ব।

টেলর কর্মক্ষেত্রে সৈন্যদের মতো নিয়মানুবর্তীতার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু মানবিক সম্পর্কের তত্ত্ব সংগঠনের কর্মরত ব্যক্তিদের মানবিক চাহিদার ওপরে আলোকপাত করেছিল। এর ফলে, মানবিক সম্পর্কের তত্ত্ব একটি ভিন্ন উদ্দেশ্য ধারণ করেছিল। বৈজ্ঞানিক পরিচালন তত্ত্বে যে সীমাবদ্ধতা রয়েছে ঠিক একইভাবে প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনের ক্ষেত্রেও সীমাবদ্ধতা রয়েছে। বৈজ্ঞানিক পরিচালন এবং মানবিক সম্পর্কের তত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য মেয়োর তত্ত্বের দ্বারা পরিস্ফুষ্ট হয়। মেয়োর ধারণায় কর্মীদের মানসিক অসামঞ্জস্যতার থেকে যৌক্তিক প্রতিক্রিয়া কর্মীদের প্রতিরোধের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। মেয়ো কর্মীদের শ্রমিকসংঘের সদস্য হওয়া বা যৌক্তিকতার ওপরে আলাকপাত করেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, টেলরের মতবাদ মেয়োর তুলনায় শ্রমিকদের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে অনেক বেশি সংবেদনশীল। তারা এও বলেন যে, উভয় মতবাদের মধ্যে পার্থক্য আলোচনাক্ষেত্রের কৌশল থেকে উদ্ভুত।

১.৪.২ চেষ্টার বার্নার্ড - (১৮৮৬-১৯৬২)

চেষ্টার আরভিং বার্নার্ড ছিলেন আমেরিকান ব্যবসায়িক নির্বাহী। পরিচালন এবং প্রাতিষ্ঠানিক তত্ত্বের স্রষ্টা, তাঁর গুরুত্বপূর্ণ বই হল *The Functions of the Executive*, যা আসলে প্রাতিষ্ঠানিক ও পরিচলনগত দৃষ্টিভঙ্গির উপর ভিত্তি করে লেখা। বার্নার্ডের মৌলিক নীতিতে কৌশলগত পরিচালন পরিসরে পরিবর্তন এনেছিল। এই বিশ্লেষণে

দুটি জিনিসের উপর দৃষ্টিপাত করা হয়েছিল। একটি হল পরিসংখ্যান থেকে প্রগতিশীল কাঠামোয় উত্তরণ এবং দ্বিতীয়ত পরিবেশের ভূমিকার ওপর আলোকপাত।

চেষ্টার বার্নার্ড বিশ্বাস করতেন যে প্রথাগত প্রতিষ্ঠান তৈরি হয় কতকগুলি অনানুষ্ঠানিক গোষ্ঠী দিয়ে; এই অনানুষ্ঠানিক গোষ্ঠীগুলি পরবর্তীকালে আনুষ্ঠানিক গোষ্ঠীতে রূপান্তরিত হয়। এই গোষ্ঠীগুলির বিশ্বাস ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠানের সংস্কৃতি ও দৃঢ় মনস্কতাকে প্রতিষ্ঠিত করে, যা প্রতিষ্ঠানকে আরো বেশি করে গ্রহণযোগ্য করে তোলে।

কর্তৃপক্ষের গ্রহণযোগ্যতার তত্ত্ব : পরিচালনতাত্ত্বিক চেষ্টার বার্নার্ড বিশ্বাস করতেন যে প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কার্যকারিতা ও দক্ষতা বিশেষভাবে প্রয়োজন। কার্যকারিতা বলতে তিনি বুঝিয়েছেন, প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনের সময়োপযোগী উপায়। তার মতে দক্ষতা হল কর্মীদের উদ্দেশ্য বুঝতে প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা। বার্নার্ড বিশ্বাস করতেন যে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সম্পন্ন হবে এবং কর্তৃপক্ষের গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে, যখন কর্মচারীরা অনুভব করবে যে তাদের ব্যক্তিগত চাহিদা পূর্ণ হচ্ছে; এটি কর্তৃপক্ষের গ্রহণযোগ্যতার তত্ত্ব হিসাবে পরিচিত।

বার্নার্ডের মতে প্রত্যেক ব্যক্তির চাহিদার পূরণ ও সার্থক মনোভাব একটি প্রতিষ্ঠানের দক্ষতাকে বিশেষ উচ্চতায় নিয়ে যেতে সাহায্য করে। তিনি আরো বলেছেন একটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সদস্যদের অন্তর্গত সহযোগিতার মান ঐ প্রতিষ্ঠান তার সদস্যদের কতটা তৃপ্ত করতে সক্ষম হচ্ছে তার উপর নির্ভর করবে।

যে প্রতিষ্ঠান দক্ষতার সঙ্গে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে সেই প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব দীর্ঘদিন ধরে স্থায়ী হয়। বার্নার্ডের মতে একটি প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা কেবলমাত্র তার উদ্দেশ্য পূরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। সুতরাং প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বলতে বার্নার্ড যা বুঝিয়েছেন, তা গতানুগতিক অর্থ থেকে অনেকাংশেই ভিন্ন। বার্নার্ড ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কার্যকরী সম্পর্কের উপরই আলোকপাত করেছিলেন। তাঁর ১৯৩৮ সালের প্রকাশিত বিখ্যাত গ্রন্থ *The Function of the Executive*-এ দেখান কীভাবে কার্যকারিতা এবং দক্ষতা মূলগতভাবে ভিন্ন। যখন একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য পূর্ণ হয় তখন আমরা বলতে পারি যে সেটি কার্যকরী হয়েছে। যখন একটি কার্যের ফলাফল অসন্তোষজনক হয়, তখন সে কাজটি অকার্যকারী হয়েছে বলে মনে করা হয়। যদি কার্যটির ফলাফল গুরুত্বহীন অথবা নগণ্য হয় তাহলেও কার্যটি ‘কার্যকরী’ হয়েছে বলে বলা হয় (চেষ্টার বার্নার্ড, ১৯৩৮, পৃ. ১৯)।

কর্তৃপক্ষের গ্রহণ তত্ত্ব বলে যে একজন পরিচালকের কর্তৃত্ব নির্ভর করে, যে সেই কর্তৃত্ব মেনে নিচ্ছে তার উপর। কর্মীদের মধ্যে বিশ্বাস জাগানো হয় যে পরিচালক বৈধভাবে আদেশ দিতে পারেন এবং সেই আদেশগুলি যথার্থভাবে সম্পন্ন হবার প্রত্যাশাও কর্মীদের মধ্যে রয়েছে। এই প্রত্যাশার বেশ কয়েকটি কারণ আছে :

- কর্মচারীদের আদেশ মেনে চলার জন্য পুরস্কৃত করা হবে।
- আদেশ না মানার জন্য তাকে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে।
- পরিচালকের অভিজ্ঞতার জন্য শ্রমিকরা তাঁকে সম্মান করবে।

অনানুষ্ঠানিক এবং আনুষ্ঠানিক সংগঠন : বিভিন্ন সংগঠন ভিন্ন ভিন্ন শ্রমিকদের দল নিয়ে তৈরি করা হয়, এই কর্মচারীরা অনানুষ্ঠানিক সামাজিক দল তৈরি করে থাকে, যা অনানুষ্ঠানিক সংগঠনে রূপান্তরিত হয়ে যায়। এই অনানুষ্ঠানিক সংগঠন বৃহত্তর আনুষ্ঠানিক সংগঠনের মধ্যে বিদ্যমান।

আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠান কিছু নিয়মনীতির মাধ্যমে তার অর্থনৈতিক এবং উৎপাদন লক্ষ্যের উদ্দেশ্য সাধন করে থাকে। আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা ক্রমোচ্চ স্তরে বিন্যস্ত হয়ে থাকে। এই ধরনের ব্যবস্থায় প্রাতিষ্ঠানিক পরিচালক ও কর্মচারী সম্পর্ক ক্রমোচ্চস্তরে বিন্যাসের দ্বারা পরিচালিত হয়। কর্ম সংক্রান্ত নির্দেশ উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ থেকে কর্মচারীদের প্রতি প্রবাহিত হয় ক্রমোচ্চস্তর বিন্যাসের মাধ্যমে।

বার্নার্ড প্রতিষ্ঠানকে মানুষের পারস্পরিক সহযোগিতার ব্যবস্থা হিসাবেই দেখেছেন এবং লক্ষ্য করেছেন যে এই ব্যবস্থা সাধারণভাবে ক্ষণস্থায়ী। একমাত্র রোমান ক্যাথলিক চার্চ ছাড়া কোন প্রতিষ্ঠানই দীর্ঘমেয়াদি অস্তিত্ব দাবি করতে পারে না। বার্নার্ডের মতে প্রতিষ্ঠান যে দীর্ঘমেয়াদি হয়ে উঠতে পারে না, তার কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে কার্যকারিতা ও দক্ষতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব সহযোগে আলোকপাত করতে হবে।

বার্নার্ড প্রশাসকের দায়িত্বগুলি সংক্ষিপ্তভাবে নির্দিষ্ট করেছেন :

- যোগাযোগ ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠা করা এবং তাকে যথার্থভাবে বজায় রাখা,
- অন্যান্য সদস্যদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় পরিষেবা আদায় করে নেওয়া,
- প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য নির্দিষ্ট করা।

বার্নার্ড দুটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব উদ্ভাবন করেছিলেন—প্রথমটি কর্তৃত্বের তত্ত্ব এবং অপরটি উৎসাহ ভাতা (Incentives)। উভয়কেই যোগাযোগ ব্যবস্থার নিরিখে দেখেছেন এবং সাতটি অপরিহার্য নীতি প্রণয়নও করেছেন :

- যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রবাহপথ সুনির্দিষ্ট হতে হবে,
- সকলকে যোগাযোগের প্রবাহপথ সম্পর্কে অবগত হতে হবে,
- সকলেই যেন যোগাযোগের প্রবাহ পথে সহজেই পৌঁছতে পারেন,
- যোগাযোগ ব্যবস্থা পদ্ধতি হিসেবে যতটা সম্ভব সরাসরি বা বাধাহীন হবে,
- যোগাযোগ ব্যবস্থার কেন্দ্রে ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির কর্ম দক্ষতা যথার্থ হতে হবে,
- যোগাযোগ ব্যবস্থা নির্বিঘ্ন হবে, বিশেষত যখন প্রতিষ্ঠানের কাজ চলেছে,
- প্রতিটি যোগাযোগ যাচাই করে নেওয়া উচিত।

বার্নার্ডের মতে কর্তৃত্বমূলক যোগাযোগ সফল হতে পারে যদি—

(ক) যোগাযোগ সহজে বোধগম্য হয়ে ওঠে,

(খ) যদি তা প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যহীন হয়ে না পড়ে,

(গ) যদি তা ব্যক্তিগত আগ্রহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এবং

(ঘ) যদি সংগঠনের অভ্যন্তরের ব্যক্তিগণ তা মেনে চলার জন্য মানসিক ও শারীরিকভাবে সক্ষম হয়।

অতএব উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের উপর যোগাযোগ ব্যবস্থা কর্তৃত্বমূলক কিনা তা নির্ভর করে না, বরং তা অধস্তন কর্মচারীদের উপরই নির্ভর করে।

বার্নার্ড তাঁর *The Economics of Incentives* বই-এর ১১ নম্বর অধ্যায়ে বলেছেন, ‘যে কোন ধরনের প্রতিষ্ঠানের উৎসাহ ভাতা প্রদানের বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে দেখা যায় সেই প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব

বজায় রাখার প্রশ্নে’। বস্তুগত প্রাপ্তি থেকে শুরু করে বিমূর্ত সহায়তা অবধি বিভিন্ন ধরনের উৎসাহ ভাতা দেওয়া হয়ে থাকে। এর মধ্যে সাধারণ উৎসাহ ভাতাও থাকে, যা সামাজিক সম্পর্কে ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দকে নিশ্চিত করে থাকে (বার্নাড চেস্টার, ১৯৩৮, পৃ. ১৩৯-১৪৯)।

অনেকে (যেমন, Guy Callender) অভিযোগ করে থাকেন যে দ্বিতীয় অধ্যায়ে বার্নাডের দেওয়া দক্ষতার সংজ্ঞা যথেষ্ট বিভ্রান্তিকর। আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানের সংজ্ঞা সম্পূর্ণরূপে সীমাবদ্ধ বলা চলে। বার্নাডের কর্তৃত্ব বিষয়ক ধারণাগুলি এই বাস্তব সত্য স্বীকার করে নিতে অসমর্থ হয় যে নেতৃত্ব প্রদানকারী ব্যবসায়ীরা তাদের ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে তাদের অধস্তন কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণ, দমন এবং নির্দেশ দিয়ে থাকেন। বার্নাড একটি প্রতিষ্ঠান ও তার গ্রাহকদের সম্পর্ক বিষয়ে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করেননি। বার্নাড একটি ব্যবসায়ী সংস্থার প্রশাসক কীভাবে আধিকারিক সভা (Board of Directors) ও লগ্নিকারীদের সাথে আলাপ আলোচনা করবেন সে দিকেও আলোকপাত করেননি। এমনকি, কর্মীদের নির্দেশনা প্রদান করার ক্ষেত্রেও প্রশাসকের দায়িত্বগুলি সম্পর্কে কোন আলোচনা নেই তাঁর লেখনীতে।

বার্নাডের দৃষ্টিকোণের সাথে মেরি পার্কার ফলেট এর তত্ত্বের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে।

১.৪.৩ মেরি পার্কার ফলেট (১৮৬৮-১৯৩৩)

মেরি পার্কার ফলেট (৩ই সেপ্টেম্বর ১৮৬৮—১৮ই ডিসেম্বর ১৯৩৩) ছিলেন একজন আমেরিকান সমাজকর্মী ও পরিচালন উপদেষ্টা। সাংগঠনিক তত্ত্ব ও সাংগঠনিক আচরণে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। তিনি ঐতিহ্যবাহী তত্ত্বের তীব্র বিরোধিতা করেছেন। সম্পর্কের ক্ষেত্রে মনোযোগের অভাব এবং কর্মচারীর প্রাথমিক মানবিক চাহিদা তাঁর আলোচনা কেন্দ্রে উঠে এসেছে। তিনি ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এবং অংশগ্রহণমূলক সিদ্ধান্ত তৈরির মুখ্য প্রবক্তা ছিলেন। সাংগঠনিক অধ্যয়নের উন্নতিতে বোঝাপড়া, ক্ষমতা এবং কর্মচারীদের অংশগ্রহণের উপর তিনি আলোকপাত করেন এবং সেইসঙ্গে, বিকল্প সমাধানের পথ এবং মানবিক সম্পর্ক আন্দোলন নিয়েও বক্তব্য রাখেন। তিনি ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।

মেরি পার্কার ফলেট ক্রমোচ্চ স্তরে বিন্যস্ত সংগঠনের অনুভূমিক যোগাযোগের উপর দৃষ্টিনিবন্ধ করেন; একটি সংগঠনের মধ্যে অনানুষ্ঠানিক পদ্ধতিগুলির উপর গুরুত্ব দেয় এবং কর্তৃপক্ষের দক্ষতা বা authority of executive সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

ক্ষমতা সম্পর্কে ফলেটর ধারণা :

ফলেট জনসম্প্রদায়ের সার্বিক দিকটার কথা মাথায় রেখে “পারস্পরিক সম্পর্ক” এর ধারণা দিয়েছেন যা ব্যক্তি ও অন্যান্যদের সম্পর্কের টানাপোড়েনের দিকটা বুঝতে সহায়তা করে। ফলেট ‘সংহতি’-র ধারণার মাধ্যমে তাঁর তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। এই “সংহতি” অথবা “শক্তি প্রয়োগ” ছাড়াই ক্ষমতার বিভাজনের ধারণাটি তাঁরটি মস্তিক প্রসুত। ‘ক্ষমতা প্রয়োগের’ পরিবর্তে (Power over) ‘ক্ষমতা সহ’ (Power with) চলার বার্তা তাঁর আলোচনায় পরিস্ফুট হয়েছে।

ফলেট ক্ষমতা সঞ্চালন তত্ত্বের (Circular theory of power) উদ্ভাবকও ছিলেন। তিনি সম্প্রদায়ের সার্বিক বৈশিষ্ট্যের কথা মাথায় রেখে “পারস্পরিক সম্পর্ক” এর ধারণা দিয়েছিলেন, যা ব্যক্তিমানুষের সাথে অন্যান্যদের সম্পর্কের টানাপোড়েদের দিকটা বুঝতে সাহায্য করবে। ১৯২৪ সালে প্রকাশিত তাঁর *Creative Experience*

বইটিতে তিনি লেখেন, 'প্রতিক্রিয়ার আদানপ্রদানের মধ্যে ক্ষমতার জন্ম হয়ে থাকে, এবং এরপর এই প্রতিক্রিয়াগুলি একটি ব্যবস্থার আকার নেয়। ঐ ব্যবস্থার কাঠামো আরো ক্ষমতার দিকে নিয়ে যায়। ব্যক্তিত্বের দিক থেকে আমি আমার নিজের উপর আরো বেশি করে নিয়ন্ত্রণ করতে পারব, যখন আমার বিভিন্ন আগ্রহগুলিকে সংহত করতে পারবো। সামাজিক সম্পর্কে ক্ষমতা নিজেকে নির্মাণ করতে সক্ষম। ক্ষমতা জীবন শক্তির বৈধ এবং অনিবার্য ফলাফল হিসাবে প্রতিভাত হয় আমরা সবসময়ই ক্ষমতার বৈধতা সম্পর্কে পরীক্ষা করতে পারি, এই প্রশ্ন করে যে ক্ষমতার প্রক্রিয়ার সাথে অন্তরের যোগ রয়েছে, নাকি বাহ্যিকভাবে ক্ষমতার প্রযুক্তি হচ্ছে।

ফলেট দেখিয়েছেন যে ''ক্ষমতা সহ চলা'' এবং ''ক্ষমতার প্রয়োগ''-এর ধারণার মধ্যে যথেষ্ট ভিন্নতা রয়েছে। তিনি আরো বলেছেন যে প্রতিষ্ঠান সাধারণভাবে ক্ষমতার প্রয়োগের পরিবর্তে ক্ষমতা সহ চলার বার্তা দিতে পারে, সেই প্রতিষ্ঠান ভিন্ন ফলাফলের প্রত্যাশী হতে পারে। তাঁর মতে রাজনীতি অথবা শিল্পে গণতন্ত্র বলতে ''ক্ষমতার সহ চলার'' ধারণাকেই বোঝানো হয়ে থাকে (Follet, 1924, 187)। তিনি সংহতি এবং ''ক্ষমতা বিভাজনের'' তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। সমঝোতা, সংঘাতের সমাধান, ক্ষমতা এবং কর্মচারীদের অংশগ্রহণ সম্পর্কে তাঁর ধারণা সাংগঠনিক অধ্যয়নকে গড়ে তুলতে বিশেষভাবে প্রবাবিত করেছে। মেরি পার্কার ফলেট ''সংহতির মাধ্যমে সংঘাতের সমাধান''—এই ধারণার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। সংহতির মাধ্যমে সমাধানের অর্থ হলো প্রতিটি পক্ষের যথার্থ চাহিদাগুলো নির্দিষ্ট করা, যা দুই পক্ষের তরফেই যেন উপকার হয় "Win Win", যা অসামঞ্জস্যপূর্ণ চাহিদাগুলো পূরণের লক্ষ্যে কাজ করলে সব সময় সম্ভব হয়ে ওঠে না।

নূতন গণতন্ত্র সম্পর্কে ফলেটর ধারণা :

ফলেট তাঁর গবেষণা চলাকালীন সকলের লাভ এই দর্শন প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট অবদান রেখেছেন। সংঘাত সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল যে সংঘাতকে বহুত্বের কাঠামো হিসেবে বিবেচনা করে সুসংহত সমাধান সূত্র খুঁজে পাওয়ার একটি সুযোগে পরিণত করা উচিত। তিনি সামাজিক কেন্দ্র স্থাপন করার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। ফলেট সাধারণ মানুষদের সামাজিক ও দলগত কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত করতেন, তিনি মনে করতেন এই ধরনের সামাজিক কার্যকলাপের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ গণতন্ত্র সম্পর্কে অবগত হবে। তাঁর গ্রন্থে লিখে ছিলেন, 'কেউই আমাদের গণতন্ত্র দিতে পারে না, আমাদের গণতন্ত্র শিখে নেওয়া উচিত'। তিনি আরো বলেছেন এই নতুন গণতন্ত্র সম্পর্কে প্রশিক্ষণ একেবারে মাতৃক্রোড় থেকেই শুরু হওয়া উচিত। প্রাথমিক শিক্ষা বিদ্যালয়ে খেলাধূলা জাতীয় কার্যকলাপের মধ্য দিয়েই এই শিক্ষার প্রসার ঘটানো উচিত। নাগরিকতার শিক্ষা কেবলমাত্র ভালো প্রশাসনিকতার শ্রেণি কক্ষ কিংবা সাধারণ জ্ঞানের অথবা সামাজিক শিক্ষার পাঠক্রমেই পাওয়া যাবে না, এটি কেবলমাত্র সেই বিশেষ ধরনের জীবনযাপনের মাধ্যমেই নিজেদের সচেতনতা বৃদ্ধি করে লাভ করা যায়। ছাত্র জীবনের শিক্ষায়, আমাদের পারিবারিক জীবনে, ক্লাব জীবনে এবং আমাদের সমাজ জীবনে এটি অবশ্যই লক্ষ্য হওয়া উচিত।

তাঁর মতে গোষ্ঠী সংগঠন একটি সমাজকেই কেবল সাহায্য করে না, একই সঙ্গে ব্যক্তির জীবনযাত্রার উন্নয়ন ঘটায়। গোষ্ঠীগুলি ব্যক্তির মতামতের ও গোষ্ঠীর সদস্যদের জীবন যাপনের মানোন্নয়নের ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। তিনি পরামর্শ দেন যে একটি গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমেই তাদের যে সাধারণ উদ্দেশ্য থাকে, তা সম্পন্ন করা সম্ভব হবে এবং এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নও ঘটবে। মেরি পার্কার ফলেট তাঁর

নেতৃত্বদানের তত্ত্বে বলেন যে যথার্থ ক্ষমতা কখনোই শক্তি প্রয়োগ করে না, বরং তা সকলকে নিয়েই চলতে চায়। যথার্থ নেতা ফলেটের তত্ত্ব অনুযায়ী, ব্যক্তিগত ক্ষমতা প্রকাশ করার পরিবর্তে দলগত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করে থাকে।

সমন্বয়ের নীতি সমূহ :

মেরি পার্কার ফলেট সমন্বয়ের চারটি মূলনীতি উত্থাপন করেছেন—

১. প্রাথমিক পর্যায়ের নীতি (Principle of Early Stage) : এই নীতি অনুযায়ী সমন্বয় পরিচালন ব্যবস্থায় একেবারে প্রাথমিক স্তরে শুরু হওয়া বাঞ্ছনীয়; একেবারে পরিকল্পনা স্তরে যদি তা শুরু হয়, তবে ঐ পরিকল্পনার দ্বারা পরিকল্পনাগুলি সহজেই প্রয়োগ করে প্রয়োজনীয় পরিচালন কার্য সফলভাবে সম্পন্ন হতে পারে। এই ভাবে যথার্থ সমন্বয় সাধন করে একটি প্রতিষ্ঠান সহজেই সকল উদ্দেশ্য সম্পন্ন করতে পারে।

নিরবিচ্ছিন্ন নীতি : এই নীতি অনুযায়ী সমন্বয় প্রতিষ্ঠানের একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে শুরু হবে এবং প্রতিষ্ঠানের সমগ্র সময় ধরে তা বজায় থাকবে। ফলে সমন্বয়টি নিরবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া এবং সমন্বয় ক্রমাগত পরিকল্পনা, পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে সংগঠিত হতে থাকবে।

- **সরাসরি যোগাযোগের নীতি :** এই নীতি অনুযায়ী সকল পরিচালকদের উচিত অবশ্যই তার অধস্তনদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করা। এর ফলে পরিচালক ও তার অধস্তন কর্মচারীদের মধ্যে সম্পর্ক আরো দৃঢ় হয়। সরাসরি যোগাযোগ ভুল বোঝাবুঝি, অপব্যাখ্যার সম্ভাবনা কমায় এবং পরিচালক ও অধস্তনদের মধ্যে বিরোধ মেটাতে সাহায্য করে। এর সাহায্যে পরিচলক তার অধস্তনদের বিভিন্ন কার্যগুলির মধ্যে সহজেই সমন্বয় সাধন করতে পারে।

- **পারস্পরিক সম্পর্কের নীতি :** একজন ব্যক্তি অথবা বিভাগের সিদ্ধান্ত এবং বক্তব্য অপর সংগঠনের বিভাগ ও ব্যক্তির উপর প্রভাব ফেলে। একজন ব্যক্তির সিদ্ধান্ত ও কার্যকলাপ অন্যান্য সকলের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পৃক্ত, ফলে যে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সব পরিচালকের একবার চিন্তা করা উচিত, ঐ সিদ্ধান্তের প্রভাব অন্যান্য ব্যক্তি ও দপ্তরের উপর কীভাবে পড়বে; একেই বলা হয় পারস্পরিক সম্পর্কের নীতি। এই নীতি যথার্থভাবে পালন করলেই সমন্বয় সাধন সফল হবে।

মেরি পার্কার ফলেটের পরে আধুনিক পরিচালন বিশেষজ্ঞরা সমন্বয়ের আরো চারটি নীতি প্রণয়ন করেছেন। যা হল—

- **কার্যকরী যোগাযোগের নীতি :** সমন্বয় সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার পিছনে কার্যকরী যোগাযোগের অবদান যথেষ্ট, ভালো যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিটি দপ্তরে সমস্ত কর্মীর মধ্যে, পরিচালকদের মধ্যে এবং তাদের অধস্তন কর্মচারীদের মধ্যে সমন্বয় সাধনে সহায়তা করে। যোগাযোগ ব্যবস্থার সকল প্রকার বাধা ও ফাঁক এড়িয়ে গিয়ে অথবা তার সমাধান করে কার্যকরী সমন্বয় গড়ে তুলতে পারলেই প্রতিষ্ঠানের সাফল্য সম্ভব হয়ে উঠবে।

- **পারস্পরিক সম্মানের নীতি :** সমন্বয় তখনই সফল হতে পারে যদি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পারস্পরিক সম্মানের পরিস্থিতি বজায় থাকে। প্রত্যেক পরিচালক একে অপরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবেন। একই ভাবে সব কর্মচারীরাও একে অপরের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব ও সম্মান প্রদর্শন করে থাকবে। পরিচালক ও কর্মচারীদের মধ্যে মৈত্রীর সম্পর্ক বজায় রাখা বাঞ্ছনীয়। পারস্পরিক সম্মান প্রদর্শন ছাড়া সমন্বয়কে টিকিয়ে রাখা অসম্ভব।

- **লক্ষ্যের স্বচ্ছতা নীতি :** সমন্বয় তখনই সফল হতে পারে যদি প্রতিষ্ঠান তার লক্ষ্যগুলিকে স্পষ্টভাবে এবং স্বচ্ছভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং উদ্দেশ্যগুলিকে যথার্থ ভাবে বুঝে উঠতে পারে। স্বচ্ছ উদ্দেশ্য সহজে এবং শীঘ্রতার সাথে সম্পন্ন করা সম্ভব।

- **স্কেলার (Scalar Chain) শৃঙ্খলের নীতি :** স্কেলার শৃঙ্খল কর্তৃত্ব বাচক রেখা। এই রেখা প্রতিষ্ঠানের সমস্ত সদস্যকে (পরিচালক থেকে কর্মচারী) উচ্চতর থেকে নিম্নস্তরে যুক্ত করে। রেখার নিচের দিকে থাকা প্রতিটি সদস্য নির্দিষ্ট থাকবে। আবার উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ তাঁর অধস্তন কর্মচারীকে তাঁর নিয়ন্ত্রণের পরিধির মধ্যে রাখবে। যথার্থ যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য Scalar শৃঙ্খল অপরিহার্য। সাধারণ পরিস্থিতিতে Scalar শৃঙ্খলকে কখনোই বিচ্ছিন্ন করা উচিত নয়।

যদিও ফলেট তাঁর মতবাদ সম্পর্কে স্বতঃসিদ্ধ যুক্তি প্রদান করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন, কিন্তু হথর্ন অধ্যয়ন থেকে পরবর্তীকালে বেশ কয়েকটি সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল।

১.৫ উপসংহার

মানব সম্পর্ক সম্বন্ধে ধারণা টেলরের সাবেক বৈজ্ঞানিক ভাবধারার বিরুদ্ধাচরণ করে। বৈজ্ঞানিক পরিচালন তত্ত্ব শ্রমকে বিজ্ঞান নির্ভর করে তুলেছিল, পক্ষান্তরে মানুষের সম্পর্কের সংজ্ঞা নির্দিষ্ট করেছিল যে পরিচালন ব্যবস্থায় কর্মীদের ব্যক্তি হিসেবে বিশেষ কিছু চাহিদা আছে। এই প্রক্রিয়ায় কর্মীরা তাদের কাজের মাধ্যমেই তাদের আত্ম পরিচিতি ও স্থায়িত্ব অর্জন করবে এবং এর ফলে তারা কার্যে যে পরিতৃপ্তি অনুভব করবে, তা তাদের প্রতিষ্ঠানের সমন্বয় সাধন করা ও উদ্দেশ্যপূরণে আরো উৎসাহ জাগাবে বলে মনে করা হয়েছিল। মানব সম্পর্ক আন্দোলন প্রতিষ্ঠানের প্রাধান্যকে স্বীকৃতি দেয় এবং স্বাভাবিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত যোগাযোগ ও গোষ্ঠী ব্যবস্থা ও নেতৃত্বকে স্বীকার করে নেয়। পরিচালন ব্যবস্থার মানব সম্পর্ক মতবাদ বৈজ্ঞানিক পরিচালন ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা থেকেই গড়ে উঠেছে বলে উল্লেখ করা হলেও এই ধারণা অনেকেই মেনে নিতে অস্বীকার করেন।

অনেকে তর্ক তুলেছেন যে মানব সম্পর্কের আন্দোলনে এলটন মেয়োর প্রভাব কতটা ছিল তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা যায়। অনেক তাত্ত্বিক বিশ্বাস করেন যে হথর্ন পরীক্ষার অনেক আগেই মানব সম্পর্কের ধারণা গড়ে উঠেছিল, যা এই মানব সম্পর্ক আন্দোলনকে ইন্ধন দিয়েছিল। টেলরের গবেষণা মানুষের কর্মস্পৃহা জাগাতে কোন বিষয়গুলি কার্যকরী সে বিষয়ে যথেষ্ট আলোকপাত করলেও তার মূল গবেষণা কিন্তু মানবসম্পর্কে আন্দোলনের থেকে যথেষ্ট ভিন্ন ছিল।

এ প্রসঙ্গে টেলর সমাজের সভাপতি Henry & Dennison-এর নাম উল্লেখযোগ্য। এরা টেলরের নীতিসমূহকে মানবিক সম্পর্কের ধারণার সঙ্গে সংযুক্ত করে টেলরবাদ ও মানবিক সম্পর্কের ভাবনার মধ্যে সংযোগ তৈরি করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। মানবিক সম্পর্কের ধারণার মধ্যেও শ্রমিকদের কাজের যুক্তি ও পরিচালকের নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি সম্পৃক্ত করে টেলরবাদের সঙ্গে সাদৃশ্য আনয়নের চেষ্টা করা হয়েছিল।

১.৬ সারাংশ

১৯২০-এর দশকের প্রাথমিক পর্বে সনাতন পরিচালন তত্ত্ব থেকে সরে এসে সংগঠনের মানবিক দিকের ওপর আলোকপাত করা শুরু হয় এবং কর্মীদের সামাজিক চাহিদার ওপর গুরুত্ব আরোপ করার প্রচেষ্টা হয়। মানবিক সম্পর্ক আন্দোলন এবং আচরণবাদী পরিচালন আন্দোলনের বিকাশ সম্বন্ধে একটি ধারণা এই পাঠের মাধ্যমে পাওয়া যাবে।

মানবিক সম্পর্কের বিশেষজ্ঞরা মনস্তত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বকে পরিচালনের সঙ্গে সংযুক্ত করেন। এই বিশেষজ্ঞরা আন্তর্ব্যক্তি ও আন্তর্গোষ্ঠী সম্পর্কের সাপেক্ষে সংগঠনকে সামাজিক ব্যবস্থা হিসেবে গণ্য করেন। গণপরিচালনকে গুরুত্ব দেওয়া এই তত্ত্বের বিশেষ অবস্থান। শ্রমিকদের সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা পূরণ করলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে বলে এই তত্ত্বের বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। মানবিক সম্পর্কের তত্ত্বের অন্যতম অবদানের সাক্ষর রাখেন Elton Mayo তাঁর হথর্ন গবেষণার মাধ্যমে বা Chester Barnard তার সমবায়িক ব্যবস্থার ভাবনার মাধ্যমে।

নয়া সনাতন তত্ত্ব তার তত্ত্ব ও দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা সংগঠনের মানবিক দিকের ওপর আলোকপাত করেন। বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিক ও সামাজিক মনস্তাত্ত্বিকদের দ্বারা সমৃদ্ধ মানবিক সম্পর্কের তত্ত্ব ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার প্রেক্ষিতে সংগঠনের উৎপাদনশীলতাকে পরিমাপ করতে সচেষ্ট হন।

১.৭ নমুনা প্রশ্নাবলী

(ক) দীর্ঘ প্রশ্নাবলী :

(১) মানবিক সম্পর্কের আন্দোলনের উদ্ভবের প্রেক্ষিতটি পর্যালোচনা করুন।

(২) মানবিক সম্পর্কের দৃষ্টিভঙ্গীটির মূল্যায়ন করুন।

(৩) মানবিক সম্পর্ক দৃষ্টিভঙ্গীতে এলটন মেয়োর অবদান পর্যালোচনা করুন।

(৪) হথর্ন প্রভাবের ওপর একটি সমালোচনামূলক টীকা লিখুন।

(খ) মাঝারি প্রশ্নাবলী :

(১) চেষ্টার বার্নার্ডের ‘Acceptance theory to authority’ ব্যাখ্যা করুন।

(২) একটি সংগঠনের সাপেক্ষে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে চেষ্টার বার্নার্ড কিভাবে বর্ণনা করেন?

(৩) চেষ্টার বার্নার্ডের অভিমত অনুসারে আনুষ্ঠানিক ও অনুষ্ঠান বহির্ভূত সংগঠন কিভাবে কাজ করে থাকে?

(৪) মেরি পার্কার ফলেটের ক্ষমতা ও ব্যবস্থাপনার ধারণাটি মূল্যায়ন করুন।

(৫) মেরি পার্কার ফলেটের সমন্বয় সংক্রান্ত ভাবনাটি ব্যাখ্যা করুন।

(৬) ‘নয়া গণতন্ত্র’ সম্বন্ধে মেরি পার্কার ফলেটের ধারণাটি বিস্তৃত করুন।

(গ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী :

(১) মানবিক সম্পর্ক দৃষ্টিভঙ্গির মূল ভিত্তিগুলি উল্লেখ করুন।

(২) এলটন মেয়ো-র মতানুসারে কাজের ক্ষেত্রে প্রেরণাকে গুরুত্ব দিতে গেলে কোন্ কোন্ বিষয়ে জোর দেওয়া উচিৎ?

(৩) টীকা লিখুন : আনুষ্ঠানিক ও অ-আনুষ্ঠানিক সংগঠন।

১.৮ তথ্যসূত্র

Barnard, Chester I (1938), *The Functions of the Executive*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Callender, Guy (2009), *Efficiency and Management*. London and New York: Routledge.Follett, Mary P(1924) 2001, *Creative Experience*, Bristol, U.K.: Thoemmes

Follett, Mary P(1918) 1998, *The New State: Group Organization the Solution of Popular Government*. Pennsylvania State University Press.

১.৯ নির্বাচিত পাঠ

ঘোষ, সোমা, *জনপ্রশাসন-তত্ত্ব ও প্রয়োগ*, কলকাতা, প্রগ্রেসিভ প্রকাশনা, ২০১০।

বসু রাজশ্রী, *জনপ্রশাসন*, কলকাতা, রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০০৫।

সোম, সুভাষ, *জনপ্রশাসন*।

বসু, রুমকী ও চট্টোপাধ্যায়, পঞ্চানন, *জনপ্রশাসন*।

একক-২ ❑ পরিচালনে আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি—হারবার্ট সাইমন

গঠন

২.১ উদ্দেশ্য

২.২ পরিচালনে আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ভূমিকা

২.৩ পরিচালনে আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ভব

২.৪ পরিচালনে আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ধারণা

  ২.৪.১ হারবার্ট সাইমন

২.৫ উপসংহার

২.৬ সারাংশ

২.৭ নমুনা প্রশ্নাবলী

২.৮ তথ্যসূত্র

২.৯ নির্বাচিত পাঠ

২.১ উদ্দেশ্য

একটি সংগঠনে কর্মীদের আচরণ এবং কর্মস্পৃহা বৃদ্ধির তাগিদে আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে সংগঠন পরিচালনায় ব্যবহারের কথা ভাবা হয়। আচরণবাদী পরিচালনের তত্ত্ব সাবেক পরিচালনের উৎপাদনকেন্দ্রীকতা থেকে সরে এসে নেতৃত্বের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে এবং এমন কয়েকটি বিষয়ের ওপর আলোকপাত করে, যাতে কর্মীদের কাজের তৃপ্তি বৃদ্ধি পায় এবং তাদের মানবিক চাহিদা পূরণ হয় ও ভালো কাজের পরিবেশ পায়।

নিম্নের পাঠের উদ্দেশ্য হল : ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে আচরণবাদী পরিচালন তত্ত্বের ধারণাটি উন্মুক্ত করা।

- সংগঠনে কর্মরত ব্যক্তিদের মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার গুরুত্ব ব্যক্ত করা এবং কর্মস্পৃহা সম্বন্ধে ধারণাটি স্পষ্ট করা;
- এই পাঠ শেষে সাবেক সংগঠন তত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা ও পার্থক্য নিরূপণ শিক্ষার্থীদের পক্ষে সহজসাধ্য হবে;
- পাঠটির সমাপ্তি আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সীমাবদ্ধতাগুলোকে স্পষ্ট করবে।

২.২ পরিচালনে আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ভূমিকা

ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের পরে সনাতন পরিচালন তত্ত্ব আবির্ভূত হয়, যা সামগ্রিকভাবে সংগঠনের দক্ষতা, উৎপাদনশীলতা ও কর্মীদের উৎপাদনের উপরে আলোকপাত করে। ফ্রেডারিক উইনস্লো টেলর তাঁর বৈজ্ঞানিক পরিচালন তত্ত্বের মাধ্যমে উৎপাদনে দক্ষতা ও কর্মীদের উৎপাদনশীলতার ওপর জোর দিয়েছিলেন। সনাতন

পরিচালন তত্ত্বের অপর এক নক্ষত্র চিন্তাবিদ ম্যাক্স হেবেবার তাঁর আমলাতান্ত্রিক পরিচালন তত্ত্বের মাধ্যমে সংগঠনের পরিচালনার দায়িত্বে থাকা কর্মীদের দক্ষতা ও বিশেষ ভূমিকার ওপর আলোকপাত করেছিলেন; রাষ্ট্র পরিচালনায় আমলাতন্ত্রের ভূমিকা হেবেবারের আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। হেনরি ফেয়ল সনাতন পরিচালন তত্ত্বের উপস্থাপনা করতে গিয়ে ব্যবস্থাপনার আঙ্গিকে পরিচালনায় দক্ষতা বৃদ্ধি এবং ব্যক্তিগত স্তরে কর্মীর দক্ষতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।

সনাতন পরিচালন তত্ত্বের প্রবক্তা ও বাহকগণ মানবিক ও আচরণগত গুণাগুণের ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করেননি। কর্মক্ষেত্রে কর্মীদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা বা চাহিদাকে উপেক্ষা করার জন্য সনাতন পরিচালন তত্ত্বকে সমালোচিত হতে হয়েছে।

সনাতন পরিচালন তত্ত্বের ধ্যান-ধারণা থেকে সরে এসে আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি পরিচালনের দক্ষতা আনয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির বিষয়টিকে একটি ভিন্ন আঙ্গিকে ব্যাখ্যা করতে সচেষ্ট হন; কর্মীর কর্মস্পৃহা বৃদ্ধির তাগিদকে পরিচালনের মুখ্য দায়িত্ব হিসেবে ব্যক্ত করেন। সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া ও মনস্তাত্ত্বিক উন্নয়নকে কর্মস্পৃহা বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বলে আচরণবাদী পরিচালন তাত্ত্বিকগণ উল্লেখ করেন। সনাতন পরিচালন তাত্ত্বিকগণ সমসাময়িক পরিস্থিতির চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রশাসনিক নীতির বিকাশ ঘটাতে পারেননি। আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি কর্মক্ষেত্রের পরিবেশের ওপরে আলোকপাত করে পরিচালন তত্ত্বে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করেন।

আচরণবাদী পরিচালন তত্ত্বকে মানবিক সম্পর্ক তত্ত্বের সঙ্গে একাসনে বসানো হয়, কারণ এই তত্ত্বও কর্মক্ষেত্রে মানবিক বিষয়াদির ওপর আলোকপাত করে থাকে। আচরণবাদী পরিচালন তাত্ত্বিকরা মনে করেন যে মানুষের কর্মস্পৃহা, সংঘাত, চাহিদা এবং গোষ্ঠী সম্পর্ক উৎপাদনশীলতাকে প্রভাবিত করে। এই তত্ত্বের ধারক ও বাহকগণ কর্মীকে একজন ব্যক্তি, পুঁজি ও সম্পদ হিসেবে গণ্য করে সনাতন পরিচালন তত্ত্বের যান্ত্রিকতাকে বর্জন করেছিলেন। আচরণবাদী পরিচালন তাত্ত্বিকগণ উল্লেখ করেন যে, পরিচালকগণ যদি কর্মীদের সংগঠনের রত্ন হিসেবে বিবেচনা করেন, তাহলে সংগঠনের লক্ষ্য পূরণ ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি সহজসাধ্য হবে।

সনাতন পরিচালন তত্ত্বের বিরোধীতা করে মানবিক সম্পর্ক তত্ত্বের প্রবক্তাগণ ব্যক্তিগত স্তরে কর্মীর আচরণ, যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া এবং সংগঠনে কর্তৃত্বের প্রকৃতির ওপরে আলোকপাত করেন। অনুষ্ঠান বহির্ভূত ও ব্যক্তিগত সম্পর্ক, গোষ্ঠীভিত্তিক সম্পর্ক এবং যোগাযোগের ধরণ মানবিক সম্পর্ক তত্ত্বের আলোচনার কেন্দ্রে উঠে আসে।

উক্ত আঙ্গিককে নতুন মাত্রা দেয় আচরণবাদী তাত্ত্বিকগণ, যারা মানবিক কর্মস্পৃহা এবং সামাজিক পরিবেশের সাপেক্ষে একটি সংগঠনের উৎপাদনশীলতাকে পরিমাপ করে। সংগঠনে কর্মরত ব্যক্তিদের আচরণ বিশ্লেষণ পূর্বক সংগঠনের কাজে ঐ আচরণের প্রভাব আচরণবাদী তাত্ত্বিকদের আলোচনার বিশেষ স্থান পায়। মনস্তাত্ত্বিকগণ ও সমাজতাত্ত্বিকগণ আচরণবাদী পরিচালনের দৃষ্টিভঙ্গিকে সমৃদ্ধ করেছিলেন।

মানব সম্পর্ক তত্ত্ব এবং আচরণবাদী তত্ত্ব কয়েকটি সাধারণ বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেন—

(১) উভয় তত্ত্বই মানুষের কর্মস্পৃহার ওপর আলোকপাত করে।

(২) যোগাযোগের স্পষ্টতার ওপর উভয় তত্ত্বই গুরুত্ব দেয়।

(৩) ব্যক্তিগণের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের গুরুত্ব উভয় তত্ত্বের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হয়।

(৪) ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর আচরণ উভয় তত্ত্বেরই আলোচ্য বিষয়।

উভয় তত্ত্বের মধ্যে যথেষ্ট বৈসাদৃশ্য ও লক্ষ্যণীয়। মানব সম্পর্ক তত্ত্বে গোষ্ঠীর আচরণ আচরণবাদী তত্ত্বের মত করে গুরুত্ব পায়নি। আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি মানুষকে সামাজিক জীব হিসেবে গণ্য করে এবং সেই কারণে মনে করে যে প্রত্যেক ব্যক্তি অন্যের চিন্তা ও বিশ্বাসের দ্বারা যৎপরনাস্তি প্রভাবিত হয়। এর ফলে গোষ্ঠীগতভাবে মানুষের আচরণের ধারা নির্ধারিত হয়। আচরণবাদী তাত্ত্বিকদের মতে সাংগঠনিক কাঠামোতে ব্যক্তি ও গোষ্ঠী, উভয়েরই দৃষ্টিভঙ্গি, আচরণ এবং কর্ম সম্বন্ধে বিশ্লেষণ আবশ্যক, যাতে সমগ্র সংগঠনের আচরণ উপলব্ধি করা যায়। ভাবনার এই অভিনবত্ব আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে আরো উন্নত ও আধুনিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

২.৩ পরিচালনে আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ভব

পরিচালনে আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ক্রমবিকাশ ঘটেছে বহু বছর ধরে। পরিচালনে আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তারা মনে করেন যে যেকোনো সংগঠিত কার্যকলাপের কেন্দ্রে ব্যক্তির অবস্থানকে যথাযথ গুরুত্ব সহযোগে বিবেচনা করা উচিত। যেকোনো সংগঠনে যে সকল ব্যক্তিগণ কাজ করেন তারা বিভিন্ন ধরনের পরিবেশ থেকে আসেন, তাদের স্বার্থ, চাহিদা, ভাবনা ও উচ্চাশাগুলোও ভিন্ন ধরনের। মানবিক সম্পর্কের তত্ত্বের থেকে রসদ নিয়ে ব্যক্তির বিভিন্নতার ওপর সবিশেষ আলোকপাত করে আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি পরিচালন তত্ত্বে একটি নতুন ধারণার উদ্ভব ঘটায়।

সংগঠনের কর্মরত কর্মীদের চাহিদার প্রতি পরিচালককে সংবেদনশীল করে তোলার সুসংহত প্রয়াস করেছিল মানব সম্পর্ক তত্ত্ব, যার বিকাশ ঘটেছিল বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বিশেষ পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে। ১৮০০ এর শেষভাগ থেকে ১৯২০ পর্যন্ত সময়কালে ক্রমবর্ধমান জনসাধারণের চাহিদা পূরণের জন্য আমেরিকাতে শিল্পের বিকাশ সীমাহীন হয়ে ওঠে। এইসময়ে সস্তায় শ্রম যেমন সুলভ্য ছিল, তেমনি গড়ে উঠেছিল তৈরী সামগ্রী বিক্রয়ের বাজার। শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদনের এই প্রাবল্য ধাক্কা খায় ১৯৩০ এর মন্দাকালে। বিশেষজ্ঞরা এই অভূতপূর্ব মন্দার জন্য দায়ী করেন পরিচালকদের এবং সমস্ত সহানুভূতি গিয়ে পড়ে শ্রমিকশ্রেণীর ওপরে। ১৯৩৫ সালে মার্কিন সংসদ তথা কংগ্রেস Wagner Act প্রণয়ন করে, যা শ্রমিক সংগঠন ও পরিচালকের মধ্যে দরকষাকষিকে আইনি বৈধতা দেয়। ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকা আধিকারিকগণও শ্রমিক সংগঠনের চাপ এবং মোকাবিলার উপায় খুঁজতে থাকেন। এই পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে প্রাথমিক পর্বে মানব সম্পর্ক তত্ত্বের প্রবক্তাগণ যে প্রস্তাব গ্রহণ করেন তা হল, কর্মী যদি তার কাজ থেকে তৃপ্তি লাভ করেন, তাহলে তিনি সংগঠনে যোগদান করবেন না। ব্যবসায়িক পরিচালকগণ, অতএব, মানবসম্পর্কের পদ্ধতি গ্রহণ করে শ্রমিক সংগঠনের হুমকি ও চাপ মোকাবিলা করতে তৎপর হয়ে ওঠেন।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পক্ষেত্রে দ্বিতীয় পরিবর্তন দেখা দেয়। আচরণবাদী বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণের কথা ভাবা শুরু করেন, যেখানে বৈজ্ঞানিক পরিচালনের নানা কৌশল শিক্ষার পরিবর্তে কর্মীদের ওপরে আলোকপাত করা হবে। হথর্ন পরীক্ষার মত গবেষণাগুলো কর্মক্ষেত্রে মনস্তাত্ত্বিক এবং সমাজতাত্ত্বিক বিষয়াদির দিকে পরিচালকমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

১৯৩২ সাল নাগাদ হথর্ণ পরীক্ষা সমাপ্ত হয়। যেখানে প্রায় ২০০০০ কর্মী কোনো না কোনো ভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। এই গবেষণা যে বিষয়টি স্পষ্ট করে তা হল কর্মক্ষেত্রের পরিবর্তিত পরিবেশ নয়, কর্মীদের মনোভাব তাদের উৎপাদনশীলতাকে প্রভাবিত করে। কর্মীগোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে সম্পর্ক এবং কর্মীদের নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক এবং তত্ত্বাবধায়কদের সঙ্গে কর্মীদের সম্পর্ক উৎপাদনশীলতাকে প্রভাবিত করে বলে ক্রমশ প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। হথর্ণ পরীক্ষা পরিচালন তত্ত্বকে সরলীকৃত 'অর্থনৈতিক ব্যক্তি'র মডেলের পরিবর্তে মানবিক ও বাস্তবগ্রাহ্য 'সামাজিক ব্যক্তি'র মডেলের দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা বিবেচনা করা শুরু করে। এলটন মেয়ো উল্লেখ করেন যে পরিচালকগণ যদি ব্যক্তিগত ও বিষয়গত কর্মকৌশল গ্রহণ করে, তাহলে একটি নতুন সামাজিক ব্যবস্থার সূত্রপাত হবে, যেখানে ব্যক্তিগত সহযোগিতা বৃদ্ধি পাবে।

মেরি পার্কার ফলেট তাঁর পরিচালনসংক্রান্ত অভিজ্ঞতা এবং আইন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং দর্শনের জ্ঞান ব্যবহার করে এই সত্যে উপনীত হন যে প্রত্যেক কর্মী তার আবেগ, বিশ্বাস, মনোবৃত্তি ও অভ্যাসের একটি জটিল আবর্তে ঘূর্ণায়মান, যা পরিচালকের নজরে থাকা উচিত। ফলেটের মতে, যদি পরিচালক প্রত্যেক কর্মীর কর্মস্পৃহার পেছনে সুপ্ত ইচ্ছাগুলিকে যথাযথভাবে স্বীকৃতি দেন, তবে কর্মীকে অতিরিক্ত শ্রম দান করতে তিনি উদ্বুদ্ধ করতে পারবেন। ১৯৬০-এর দশকে রচিত *The Human Side of Enterprise* নামক রচনায় মার্কিন বিশেষজ্ঞ ডগলাস ম্যাকগ্রেগর মানব প্রকৃতির কয়েকটি আশাব্যঞ্জক ভাবনার ওপরে আলোকপাত করেন। ম্যাকগ্রেগর প্রত্যেক কর্মীকে একজন উৎসাহী ও সৃজনশীল ব্যক্তি হিসেবে অবলোকন করেন, যিনি, তাঁর মতে, সুযোগ পেলে মহৎ কিছু সৃষ্টি করতে পারেন। Theory Y হিসেবে ম্যাকগ্রেগর তাঁর এই ভাবনাকে চিহ্নিত করেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরিচালন কেন্দ্রিক গবেষণায় পরিবর্তন আনে; গবেষণার আয়তন ও যৌক্তিকতায় যে ব্যপ্তি আসে তা অনবদ্য। সংগঠন সম্বন্ধে পঠনপাঠনে যুক্তিসিদ্ধ আলোচনা ও গবেষণা বিশেষ জায়গা করে নেয়। হারবার্ট সাইমন, জেমস্ জি মার্চ এবং তথাকথিত কার্নেগি ধারার গবেষকরা সাংগঠনিক আচরণবিধির ওপর গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা শুরু করেন।

অন্যতম আচরণবাদী তাত্ত্বিক চেষ্টার বার্নার্ড সংগঠনের কার্যকারিতার মাপকাঠি হিসেবে মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক উপাদানসমূহের গুরুত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি বলেন যে সংগঠনের বাইরে এবং সংগঠনের অভ্যন্তরে ব্যক্তির আচরণ পৃথক হয়। বার্নার্ডের এই ভাবনাসূত্রকে আরো বিকশিত করেন হারবার্ট সাইমন তাঁর *Administrative Behavior* নামক গ্রন্থের মাধ্যমে।

২.৪ পরিচালনে আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ধারণা

পরিচালনে আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ধারণা আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি সংগঠনকে একটি সামাজিক অবয়ব হিসেবে অবলোকন করে। মনস্তত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব প্রভৃতি আচরণবাদী বিজ্ঞান থেকে রসদ সংগ্রহ করে কর্মীর আচরণ সম্বন্ধে একটি বহুমুখী ও আন্তঃশাস্ত্রীয় গবেষণা এই দৃষ্টিভঙ্গি আচরণবাদী বিজ্ঞান বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। কর্মীর ভবিষ্যৎ তথা সম্ভাব্য আচরণ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণীও এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রবর্তকদের উদ্দেশ্য ছিল। কর্মস্পৃহা, নেতৃত্ব,

যোগাযোগ, গোষ্ঠী আচরণ এবং অংশগ্রহণমূলক পরিচালন সম্বন্ধে আলোচনা এই দৃষ্টিভঙ্গির ধারক ও বাহকদের বিশেষ অবদান এবং কর্মীর কাজের মান বৃদ্ধি ও সংগঠনের লক্ষ্যপূরণের তাগিদে এই সকল নীতিগুলোর ওপর বিশেষভাবে এঁরা আলোকপাত করেন। বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিক এবং মনস্তাত্ত্বিকগণ, যেমন, অ্যাব্রাহাম এইচ ম্যাসলো, ডগলাস ম্যাকগ্রেগর, ফ্রেডরিক হার্জবার্গ, ক্রিস আরগিরিস প্রমুখগণ এই দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ও সমৃদ্ধিতে বিশেষ অবদানের সাক্ষর রাখেন।

আচরণবাদী বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গিকে নিম্নরূপে সংক্ষিপ্তসারে লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে।

- প্রত্যেক সংগঠন একটি সামাজিক ও কৌশলগত ব্যবস্থা;
- বহুবিধ বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উপাদানের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সংগঠনের কর্মীদের নিজেদের ও গোষ্ঠীগত আচরণবিধি গড়ে ওঠে;
- মানবিক চাহিদার সাপেক্ষে সংগঠনের লক্ষ্যগুলো স্থিরীকৃত হওয়া আবশ্যক;
- বহুবিধ মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গি ও মুল্যবোধের সমাহারে কর্মীদের আচরণ নির্ধারিত হয়, যা তাদের কাজকে প্রভাবিত করে থাকে;
- সংগঠনের মধ্যে কিছু মাত্রায় সংঘাত অনিবার্য এবং তা মাথায় রেখেই কর্মীর কাজের মূল্যায়ন করা আবশ্যক।

আচরণবাদী বিজ্ঞান মনে করে যে নেতৃত্বের গুণগত মানের ওপরে পরিচালনের সাফল্য নির্ভর করে। এই বিজ্ঞান গোষ্ঠী সক্রিয়তার ওপর আলোকপাত করে এবং সংগঠনের কার্যকারিতার ওপর ব্যক্তির মনস্তাত্ত্বিক অবস্থান ও আচরণের প্রভাবকে স্বীকার করে; ফলে একে মানব সম্পর্ক দৃষ্টিভঙ্গির তুলনায় উন্নততর বলে মনে করা হয়।

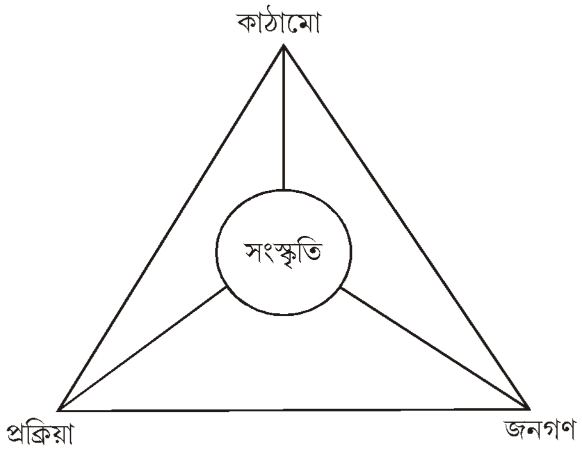

উপরিউক্ত চিত্রটির মাধ্যমে বোঝানো যেতে পারে যে কিভাবে প্রক্রিয়া ও কাঠামোর সাপেক্ষে ব্যক্তির সংস্কৃতি ও আচরণ প্রভাবিত হয়।

২.৪.১ হারবার্ট সাইমন

বিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাত চিন্তাবিদ এবং বৈজ্ঞানিক ভাবনার অন্যতম পথিকৃত হারবার্ট সাইমন আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেন। বিজ্ঞানের জগতে একটি বিশিষ্ট নাম হারবার্ট সাইমন অধ্যাপক, অর্থনীতিবিদ, সমাজতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক হিসেবেও যথেষ্ট খ্যাতিমান ছিলেন। তিনি তাঁর কাজের মাধ্যমে পরিচালন সাহিত্য, অর্থনীতি, যৌক্তিক মনস্তত্ত্ব এবং কৃত্রিম বৌদ্ধিক রচনায় যথেষ্ট অবদানের সাক্ষর রেখেছিলেন। তিনি কার্নেগি মেলন বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫২ বছর ব্যাপী অধ্যাপনা করেন। মেরি পার্কার ফলেটের গোষ্ঠী সক্রিয়তা সংক্রান্ত ভাবনা, এলটন মেয়োর মানব সম্পর্ক দৃষ্টিভঙ্গি, চেষ্টার বার্নার্ডের প্রশাসনের কাজ সম্বন্ধে ভাবনা প্রভৃতি তাঁকে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল। হারবার্ট সাইমন তাঁর অনবদ্য ধারণা, বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্বের জন্য খ্যাত ছিলেন। তিনি গতিশীল পরিবেশে মানব সিদ্ধান্ত গ্রহণের ধারণাকে ব্যক্ত করেন। এই পণ্ডিত নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত চিন্তাবিদ সংগঠনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া সম্বন্ধে নতুন ধারণা পেশ করেন এবং অর্থনীতিতে এই গবেষণাই তাঁকে নোবেল পুরস্কার এনে দেয়।

হারবার্ট সাইমন কর্তৃক রচিত বই *Administrative Behavior* যথেষ্ট গুরুত্বের দাবী রাখে, বিশেষত প্রশাসনিক আচরণবিধির পাশ্চাত্তের মনস্তত্ত্ব, কর্তৃপক্ষের ভূমিকা, দক্ষতার মাপকাঠি, আনুগত্য এবং সংগঠনের পরিচয় ও সংগঠন পুণর্গঠন সম্বন্ধীয় ধারণাগুলো যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। সাইমনের ‘সীমিত যৌক্তিকতা’র ধারণা, যোগাযোগ এবং কর্তৃত্ব সম্বন্ধে ধারণা সবিশেষ প্রশংসিত।

বার্নার্ডকে অনুসরণ করে সাইমন প্রশাসন বিজ্ঞানের পাঠ ও আলোচনা করেন। বার্নার্ডের প্রারম্ভিক রচনাগুলোকে কাঠামো হিসেবে ধরে নিয়ে সাইমন আরো প্রাসঙ্গিক ধারণার জন্ম দেন এবং নতুন নামে প্রশাসন বিজ্ঞানে নব নব সংযোজন করেন। সাইমন উপলব্ধি করেন যে মানুষের আচরণ সম্বন্ধে কোনো যথাযথ তত্ত্ব গড়ে তোলা সম্ভব নয়, যদি না সঠিক বিশ্লেষণ একক গড়ে তোলা যায়। সাইমন তাঁর বইতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভিত্তিকে বিশ্লেষণের একক হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, সম্পূর্ণ সিদ্ধান্তকে নয়। সাইমন তাঁর রচনায় দেখিয়েছেন যে কিভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করে সংগঠনকে বোঝা যায়; তিনি আরো উল্লেখ করেন যে সিদ্ধান্তের ভিত্তি বা পূর্বানুমানের ওপর নির্ভর করে প্রশাসনিক আচরণ নির্ধারিত হয়; অতঃপর কিভাবে প্রশাসনিক আচরণ প্রভাবিত হয় সিদ্ধান্তের পূর্বানুমানের দ্বারা বা সিদ্ধান্তের পূর্বানুমান প্রভাবিত হয় প্রশাসনিক আচরণের দ্বারা অথবা কিভাবে সাংগঠনিক কাঠামো সংগঠনের অভ্যন্তরে ব্যক্তির পূর্বানুমানকে প্রভাবিত করে, যাতে ব্যক্তির লক্ষ্য সংগঠনের লক্ষ্যের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায় ইত্যাদির ওপরে প্রশাসনিক আচরণবিধি নির্ভর করে।

সাইমন তাঁর বই *Administrative Behavior : A Study of Decision Making Proceses in Administrative Organisations*-এ সিদ্ধান্ত গ্রহণকে প্রশাসনের হৃদয় বলে উল্লেখ করেন। সাইমনের মতে, একটি সংগঠন হল একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ কাঠামো; অতএব যেকোনো প্রশাসনিক তত্ত্বেরই প্রাথমিকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া এবং কর্মপ্রক্রিয়ার ওপর আলোকপাত করা উচিত। সাইমন আরো উল্লেখ করেন যে বিকল্প কর্মপরিকল্পনাকে কেন্দ্র করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া আবর্তিত হয়। সাইমন বলেন যে মানুষের পছন্দের পশ্চাতে অবস্থিত যুক্তি ও মনস্তত্ত্ব প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকে প্রভাবিত করে। সাইমন মনে করেন যে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ তিনটি পর্যায় অতিক্রম করে—প্রথমে প্রশাসক সংগঠনের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ও সার্বিক পরিবেশের ওপরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন; দ্বিতীয় ধাপে প্রশাসক প্রচলিত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে কাজ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং বিকল্প কর্মপ্রক্রিয়াগুলো বিবেচনা করতে শুরু করেন এবং তৃতীয় ধাপে সমস্ত যৌক্তিক চিন্তাকে ব্যবহার করে একটি সর্বোত্তম বিকল্প সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সাইমন কর্তৃক বর্ণিত সমগ্র সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়াটি সরল বলে মনে হলেও

প্রকৃত অর্থে বিষয়টি যথেষ্ট জটিল এবং যুক্তিসিদ্ধ কর্মপ্রক্রিয়ার ওপর ভিত্তি করে বিকশিত। প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে সাইমন কর্তৃক প্রস্তাবিত যৌক্তিকতার প্রশ্নটি অনুধাবন করতে হবে।

সাইমন ঘটনা ও মূল্যমানের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করে বলেন যে প্রশাসককে নিজস্ব মুল্যমানকে যথা সম্ভব দূরে সরিয়ে রেখে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। তিনি বলেন যে প্রত্যেক সিদ্ধান্ত লক্ষ্য নির্বাচন ও প্রাসঙ্গিক আচরণের ভিত্তিতে গৃহীত হয়; প্রশাসক তার যুক্তিবোধকে ব্যবহার করে লক্ষ্য ও উপায়ের মধ্যে সংযোগ সাধন করেন। সাইমনের প্রশাসনিক আচরণ তত্ত্ব অনুযায়ী নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণের জন্য যখন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তখন বলা যেতে পারে যে মুল্যমান নির্ভর বিচার বাস্তব ঘটনা নির্ভর বিবেচনা বোধে রূপান্তরিত হয়েছে।

সাইমন যুক্তিবোধের প্রসঙ্গটি পরিবর্তনশীল হিসেবে গণ্য করেছেন এবং মানুষের যৌক্তিক বিচারের সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে যথেষ্ট অবগত ছিলেন। তিনি জানতেন যে মানুষের যুক্তিবোধ সংগঠনের পরিবেশের সাপেক্ষে পরিবর্তনশীল, যে পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে থাকে। সাইমনের মতে, প্রশাসনের কাজ হল সংগঠনের পরিবেশকে এমনভাবে বিকশিত করা, যাতে ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি যথাসম্ভব বাস্তবসম্মত হয়ে উঠতে পারে।

সাইমনের ধারণাটিকে যথাযথভাবে অনুধাবন করতে হলে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হবে :

- অর্থনৈতিক মানুষ
- প্রশাসনিক মানুষ
- সাংগঠনিক দৃষ্টিভঙ্গি

একটি সংগঠনে অভিজ্ঞতাবাদী ও নীতিমানবাচক উপাদানগুলোর ওপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়; এই উপাদানগুলোকে বাস্তব ঘটনা নির্ভর উপাদান বা মূল্যমান নির্ভর উপাদানও বলা যেতে পারে। বাস্তব ঘটনা নির্ভর উপাদানগুলো উদ্ভুত হয় সংগঠন ও তার পরিবেশ সম্বন্ধীয় তথ্যাদি ও জ্ঞান থেকে; পক্ষান্তরে মূল্যমান নির্ভর উপাদানগুলো নৈতিক ও আইনী সীমারেখার ওপর দৃষ্টিনিক্ষেপ করে গড়ে ওঠে।

অর্থনৈতিক মানুষ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে আদর্শ ভিত্তিক মডেল ও যুক্তিসিদ্ধ মডেলের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করে। কাঙ্খিত লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য বিভিন্ন বিকল্পের মধ্যে থেকে সর্বাপেক্ষা উপযোগী সিদ্ধান্তটিকে বেছে নেওয়াকে যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ বলা হয়।

প্রশাসনিক মানুষ মৌলিক যৌক্তিকতার আধারে পরিচালিত হয়ে বিকল্প কর্মধারাটি যথেষ্ট ভাল কিনা বিবেচনা করে। তিনি যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়া গ্রহণ করেন, যে প্রক্রিয়ার দ্বারা ব্যক্তিগণ সমস্যা সংজ্ঞায়িত করে, বিকল্প সমাধান খুঁজে বার করে ও তার মূল্যায়ন করে এবং শ্রেষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে ঐ সমাধান সূত্রটি প্রয়োগ করে। অর্থনৈতিক মানুষ যখন সমস্ত রকম বিকল্পগুলো বিবেচনা করে সেগুলোর পরিণাম বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে চায়। প্রশাসনিক মানুষ তখন পক্ষান্তরে কয়েকটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও সমালোচনামূলক উপাদানের ওপর নির্ভর করে সরলীকৃত প্রক্রিয়ায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে উদ্যত হয়। প্রশাসনিক মানুষ প্রচলিত প্রশাসনিক নীতির প্রতি সমালোচনামূলক নজর রেখে বিশেষীকরণ, ক্রমোচ্চ স্তর বিন্যাস, নিয়ন্ত্রণের পরিধি সহ বিভিন্ন নীতিগুলোকে পূর্ণ ভাবনার অবস্থানে নিয়ে আসে।

এ প্রসঙ্গে সাইমন বলেন যে উপরিউক্ত প্রশাসনিক নীতিগুলোর প্রয়োগ যোগ্যতা ও সিদ্ধতা প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকে অনুধাবনপূর্বক পরীক্ষণীয়। সাইমনের মতে, এই প্রবাদস্বরূপ নীতিগুলো পরস্পরের সঙ্গে স্ববিরোধপূর্ণ ও

সঙ্গতিহীন। সাইমন পাঁচটি যান্ত্রিক উপায়কে চিহ্নিত করেন, যা সংগঠনের কার্যশীলতাকে প্রভাবিত করতে পারে, এগুলো হল—

(১) **কর্তৃত্ব :** কর্তৃত্ব হল সিদ্ধান্ত গ্রহণের সেই ক্ষমতা, যা কালক্রমে অন্যান্যদের কাজের নির্দেশিকা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। সংগঠনে উর্দ্ধতন ও অধস্তনদের মধ্যে সম্পর্কের প্রেক্ষিতে কর্তৃত্বকে ব্যাখ্যা করা যায়।

(২) **যোগাযোগ :** সংগঠনের আনুষ্ঠানিক ও অনুষ্ঠান বহির্ভূত যোগাযোগ নিয়ে সামগ্রিকভাবে যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে।

(৩) **প্রশিক্ষণ :** ব্যক্তিরা যাতে প্রতিনিয়ত কর্তৃত্ব ও নির্দেশ ছাড়াই যথাযথ সিদ্ধান্ত নিতে পারে। তার জন্য উপযুক্ত শিক্ষা প্রয়োজন। যা শিক্ষাগত যোগ্যতা ও চাকুরীকালীন শিক্ষা উভয়কে নিয়ে সংগঠিত হয়।

(৪) **দক্ষতার মাপকাঠি :** একই ব্যয় সম্পন্ন দুটি বিকল্পের মধ্যে যেটি সংগঠনের লক্ষ্য পূরণে অধিকতর কার্যকরী হবে, সেটিকে বেছে নেওয়া দরকার এবং যদি দু'টি বিকল্পই একইভাবে সংগঠনের লক্ষ্য পূরণ করে, তাহলে অপেক্ষাকৃত কম খরচে যেটি প্রয়োগযোগ্য সেটিকেই বেছে নেওয়া উচিৎ।

(৫) **সাংগঠনিক পরিচয় ও আনুগত্য :** একটি সংগঠনে বিভিন্ন গোষ্ঠী ও ব্যক্তি থাকে, যারা নিজেদের একটি গোষ্ঠীর অংশ হিসেবে মনে করে বিকল্পগুলোর মূল্যায়ন করে এবং এই মূল্যায়ন করতে গিয়ে সমগ্র গোষ্ঠীর ওপর নির্বাচিত বিকল্পের সম্ভাব্য পরিণাম বিবেচনা করে।

সাইমন সংগঠনকে মানবগোষ্ঠীর যোগাযোগ ও সম্পর্কের একটি জটিল ধারা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। সংগঠন তার প্রত্যেক সদস্যের কাছে যথাসম্ভব তথ্য ও অনুমান, লক্ষ্য, মনোভাব ইত্যাদি তুলে ধরে যার ভিত্তিতে প্রতিটি সদস্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সামিল হয়। যোগাযোগের সূত্র পরিবর্তনের ফলে যদি বিশ্বাস ও মনোভাব পরিবর্তিত হয়, তাহলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ধরনে পরিবর্তন আসতে পারে। সংগঠন, সাইমনের মতে, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ, যোগাযোগকে কাঠামোকৃত করে তথ্য সঞ্চালনার পরিবেশকে তা নির্ধারণ করে, যা ক্রমান্বয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যবস্থাকে পরিচালনা করে থাকে। সংগঠনে সমন্বয়কে গুরুত্ব দিলেও সাইমন অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছেন যোগাযোগকে, যা তথ্য ও জ্ঞান সরবরাহের অন্যতম আধার হিসেবে কাজ করে। সাইমনের মতে, যোগাযোগ সংগঠনের অন্যান্য সদস্যদের সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত পূর্বানুমানকে পরিবর্তনে সাহায্য করে, যার ফলে ব্যক্তিগত লক্ষ্য ও সাংগঠনিক লক্ষ্যের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সাংগঠনিক লক্ষ্যের অভিমুখে যাওয়ার জন্য অনেকগুলো বিকল্পের মধ্যে থেকে একটি সিদ্ধান্ত বেছে নেওয়া হয়। সাংগঠনিক পরিবেশের সাপেক্ষে যে ঘটনা ও মূল্যমান নির্ধারিত হয়, তার ভিত্তিতে বাস্তব পরিণামের কথা বিবেচনা করে বাস্তবগ্রাহ্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যা ঠিক করে ব্যক্তির কোনো নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে কাজ করা বা না করা। বাস্তবে কিছু বিকল্প সচেতনভাবে নির্বাচিত হয়, কিছু অসচেতনভাবে নির্বাচিত হয়; কিছু পরিণাম কাঙ্খিত হয়, কিছু আকাঙ্খিত এবং কখনও কখনও উপায় ও লক্ষ্যের মধ্যে স্পষ্ট সীমারেখা টানাও যায় না। এইসকল সীমাবদ্ধতাগুলো অপরিহার্য হলেও যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় যখন বিকল্প নির্বাচিত হয়, তখন সকলপ্রকার সম্ভাব্য পরিণামের কথা বিবেচনা করা হয়। এই প্রক্রিয়াটি তিনটি পর্যায় অতিক্রম করে—

(১) সমস্ত বিকল্পগুলোকে চিহ্নিত করা ও তালিকাবন্ধ করা;

(২) প্রতিটি বিকল্প থেকে উদ্ভুত সম্ভাব্য পরিণামগুলোকে বিবেচনা করা;

(৩) প্রতিটি সম্ভাব্য পরিণামের যথার্থতা ও দক্ষতার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করা।

উল্লেখ্য যে, কোনো ব্যক্তি বা সংগঠনের পক্ষেই উপরিউক্ত তিনটি পর্যায়কে যথাযথভাবে বা নিখুঁতভাবে অনুসরণ করা সম্ভব নয়। কারণ কোনো অবস্থাতেই সমস্ত বিকল্প বা বিকল্পগুলোর সকল সম্ভাব্য পরিণাম পরিমাপযোগ্য হতে পারে না।

মানুষ যতই যুক্তিবোধসম্পন্ন হোক, সে তার জ্ঞান অনুযায়ী যুক্তি ব্যবহার করে; অতঃপর কাজ চালানোর জন্য কার্যকরী প্রক্রিয়া তাকে গ্রহণ করতে হয়, যাতে উক্ত সমস্যা কাটিয়ে উঠে সে বাস্তবগ্রাহ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। একটি বদ্ধ ব্যবস্থার সাপেক্ষে কয়েকটি সীমিত উপাদানকে বিবেচনা করে সীমিত বিকল্প ও তার সীমিত পরিণামের কথা মাথায় রেখে কার্যকরী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সর্বশ্রেষ্ঠ ফলাফল প্রত্যাশা করা যেতে পারে বলে সাইমন মনে করেন, যাকে সাইমন 'সীমিত যৌক্তিকতা' বলে উল্লেখ করেছেন।

জ্ঞান ও যৌক্তিকতার সীমিত বোধশক্তি ব্যবহার করে যুক্তিসিদ্ধ প্রক্রিয়ায় যে বিকল্প নির্বাচন করা হয়, সেই প্রক্রিয়াকে সাইমন 'Bounded rationality' বলে উল্লেখ করেছেন। আচরণবাদী অর্থনৈতিক চিন্তায় 'Bounded rationality' বা সীমিত যৌক্তিকতার ভাবনা কেন্দ্রীয় অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত, যা বাস্তব সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে।

সাইমনের মতে, সংগঠনের অভ্যন্তরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ একটি জটিল প্রক্রিয়া, যা বিভিন্ন উপাদানের দ্বারা প্রভাবিত হয়। প্রশাসনিক সংগঠন এবং অর্থনীতির প্রেক্ষিতে সীমিত সংখ্যক পরিস্থিতির বিবেচনা সাপেক্ষে যুক্তিবোধকে যথাসম্ভব ব্যবহার করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যপক ও জটিল কার্যটি সমাপন করতে হয় বলে সাইমন উল্লেখ করেছেন। সিদ্ধান্ত গ্রহীতা পরিস্থিতি সম্বন্ধে তাদের নিজস্ব ব্যাখ্যা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। যা সরলীকৃত বলে মনে হতে পারে। যুক্তিবোধকে সাইমন সীমিত বলে উল্লেখ করেছেন; উদাহরণ স্বরূপ তিনি বলেছেন যে সীমিত পরিমাণে প্রাপ্ত প্রাসঙ্গিক তথ্যাদির ওপরে নির্ভর করে সাধারণভাবে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, যা পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে তৃপ্তিদায়ক, অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ নাও হতে পারে। সাইমন মানুষের যুক্তিবোধের সীমাবদ্ধতার প্রসঙ্গটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কয়েকটি কারণ দর্শান—

- অপর্যাপ্ত বা ত্রুটিপূর্ণ বা বিপথদর্শী তথ্য;
- জটিল সমস্যাদি;
- তথ্য প্রক্রিয়াকরণ মানবিক সীমাবদ্ধতা;
- সিদ্ধান্তগ্রহণে ব্যয়িত সময়ের অপর্যাপ্ততা;
- কিছু সাংগঠনিক লক্ষ্য প্রসঙ্গে সিদ্ধান্তগ্রহীতাদের মধ্যে বিরোধ।

সংগঠন নিজেই সীমানা হিসেবে কাজ করে, যা তার সদস্যদের বাধ্য করে প্রত্যেক কাজের জন্য পুনর্ভাবনার অবকাশ না দিয়ে কাজ করতে। ব্যক্তির কাছে তথ্যের অপ্রতুলতার জন্য অনিশ্চয়তা তৈরী হয়, যা তথ্য প্রক্রিয়াকরণে সীমাবদ্ধতা নিয়ে আসে। সাইমন, এই কারণে বলেন যে, সমস্যার জটিলতা, সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ার দ্বিবিধ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহীতাদের সংখ্যা বিবেচনা করে আচরণবাদী সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ার ওপরেই নির্ভর করতে হয়, যা নিছক যুক্তি সিদ্ধতা নির্ভর নয়। সাইমনের প্রশাসনিক তত্ত্বের কেন্দ্রিয় বিষয়বস্তুই হল মানুষের যৌক্তিক ও অযৌক্তিক সামাজিক আচরণের মধ্যে সীমারেখা অঙ্কনের প্রয়াস। সাইমনের সীমিত যৌক্তিকতার ধারণা অনুযায়ী জটিল সমস্যা সৃষ্টি ও তার সমাধানে মানুষের ক্ষমতার সীমা স্পষ্ট; অতঃপর সর্বাধিক তৃপ্তিদায়ক (satisficing) বা যথেষ্ট তৃপ্তিদায়ক সমাধানসূত্রের কথা ভেবেই বিকল্প নির্ধারণ করতে হয়। সীমিত যৌক্তিকতার এই নীতিটি গড়ে তুলতে সাইমন মনস্তত্ত্ব; অর্থনীতি, রাজনীতি, আইন এবং সমাজতত্ত্বের দ্বারস্থ হয়েছেন, যা সাইমনের তত্ত্বকে আন্তঃশাস্ত্রীয় করে তুলেছে।

২.৫ উপসংহার

আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি একটি সামাজিক ব্যবস্থার অন্তর্গত উপাদান বা যৌক্তিক সত্তাগুলোর মধ্যে সম্পর্ক, মিথস্ক্রিয়া, যোগাযোগ, সংযোগ এবং সম্পর্কযুক্ত কৌশল বা সক্রিয়তাকে বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে অনুধাবন করে। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী সংখ্যাতাত্ত্বিক তথ্যাদি এবং গুণগত গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করে তথ্য প্রক্রিয়াকরণ করলে এবং সামাজিক সম্পর্ককে বোঝার চেষ্টা করলে কর্মীর কর্মস্পৃহা ও উৎপাদনশীলতা নির্ধারণকারী উপাদানগুলোকে সহজে বোধগম্য করা যাবে।

সাংগঠনিক উন্নয়নের কাজে আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে ব্যবহার করে কার্যকরী পরিবর্তনের সোপান প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। আচরণবাদ বিজ্ঞানসম্মত পঠনপাঠন ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে সাংগঠনিক উন্নয়নকে বাস্তবায়িত করতে সচেষ্ট হয়। সমাজতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব এবং কর্মস্পৃহার তত্ত্ব ইত্যাদি থেকে রসদ সংগ্রহ করে সংগঠনের কার্যকরী উন্নয়নকেও যেমন আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ত্বরান্বিত করে। তেমনি কর্মীর উন্নয়নকেও বাস্তবায়িত করে।

সাইমনের গ্রন্থ প্রশাসন বিজ্ঞানের এমন একটি সহায়িকা যা আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে সাংগঠনিক সমস্যাদি বিশ্লেষণ করতে উদ্যত হয়। যুক্তিসিদ্ধ মানবিক পছন্দ তথা সিদ্ধান্ত গ্রহণের আচরণবাদীও বোধশক্তিসম্পন্ন প্রক্রিয়া নির্ণয় এই গ্রন্থের কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু। *Administrative Behavior* নামক গ্রন্থটি মানুষের আচরণ, বোধশক্তি, পরিচালন কৌশল, কর্মীব্যবস্থাপনার নীতি, প্রশিক্ষণের লক্ষ্য ও পদ্ধতি, বিশেষজ্ঞ ভূমিকা, যথার্থতা ও দক্ষতা নির্ণয়ের মাপকাঠি ও যোগাযোগ প্রক্রিয়ার ওপরে আলোকপাত করে। সাইমন তাঁর বইতে যে আলোচনা করেছেন তা হল, উক্ত বিষয়গুলো কিভাবে সিদ্ধান্তগ্রহণকে প্রভাবিত করে।

২.৬ সারাংশ

বিভিন্ন শাস্ত্র থেকে রসদ গ্রহণ করে আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি যে গবেষণাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে, তার মুখ্য লক্ষ্য ছিল কর্মক্ষেত্রের আচরণ অনুধাবন। আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গির অন্যতম প্রবক্তা হলেন হারবার্ট সাইমন। যিনি প্রত্যেক কর্মীর আচরণকে সংগঠনের লক্ষ্য ও মূল্যমানের সাপেক্ষে বিশ্লেষণ করতে সচেষ্ট হয়েছিল। ল্যাসওয়েলকে অনুসরণ করে সাইমন বলেন যে একজন ব্যক্তি নিজেকে অনেক প্রকার সামাজিক, ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক, জাতিগত, ধর্মীয়, পারিবারিক, শিক্ষাগত, লিঙ্গগত, রাজনৈতিক এবং ক্রীড়া গোষ্ঠীর সদস্য হিসেবে চিহ্নিত করে। মৌলিক সমস্যা হল ব্যক্তি কিভাবে সংগঠনের সাপেক্ষে ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত পরিচয়কে স্বতন্ত্র করবে। এই কারণে প্রত্যেক সংগঠনকে তার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, উপায়, পরিণাম এবং মুল্যমানকে স্পষ্ট করে তুলতে হবে। প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সাইমনের অবদান অনস্বীকার্য এবং তাঁর গবেষণালব্ধ ফল ব্যবসায়িক গোষ্ঠীতে অপরিহার্য।

২.৭ নমুনা প্রশ্নাবলী

(ক) দীর্ঘ প্রশ্নাবলী :

(১) পরিচালনে আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর পর্যালোচনা করুন।

(২) পরিচালনে আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গী আলোচনা করুন।

(৩) পরিচালনে আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর বিকাশে হারবার্ট সাইমনের অবদান পর্যালোচনা করুন।

(৪) হারবার্ট সাইমনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ মডেল সম্বন্ধে একটি সমালোচনামূলক টীকা রচনা করুন।

(খ) মাঝারি প্রশ্নাবলী :

(১) ‘সীমিত যৌক্তিকতা’ বলতে সাইমন কী বুঝিয়েছেন?

(২) ‘সাইমনের মতে, সংগঠনের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ একটি জটিল প্রক্রিয়া’—ব্যাখ্যা করুন।

(৩) সংগঠনে যোগাযোগের ভূমিকা সম্বন্ধে সাইমনের মতামত কী?

(৪) সংগঠনের কার্যশীলতাকে কি কি বিষয় প্রভাবিত করতে পারে বলে সাইমন মনে করেছেন?

(৫) আধুনিক পরিচালনের ধারণার আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর প্রাসঙ্গিকতা সমালোচনা সহযোগে মূল্যায়ণ করুন।

(গ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী :

(১) পরিচালনে আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর প্রস্তাবনাগুলো বিশ্লেষণ করুন।

(২) মানবিক সম্পর্ক ও আচরণবাদী তত্ত্ব যে সাধারণ বিষয়ে আলোকপাত করে তেমন চারটি বিষয় উল্লেখ করুন।

(৩) টীকা লিখুন : “প্রশাসনিক মানুষ”, “অর্থনৈতিক মানুষ”।

(৪) সাইমনের মতানুসারে সংগঠনের কার্যশীলতাকে প্রভাবিত করে এমন যান্ত্রিক উপায়গুলি লিখুন।

২.৮ তথ্যসূত্র

Bennis, Warren G., *Changing Organizations*, New York, McGraw-Hill, 1966.

Filley, Alan C., and Robert J. House, *Managerial Process and Organizational Behavior*, Scott, Foresman and Company, 1969.

March, James G., and Herbert A Simon .. *Organizations*. New York: Wiley. 1958

Simon, H. A, *Administrative Behavior: A Study of Decision Making Processes in Administrative Organisation*, 2nd ed., New York: Collier/Macmillan, 1957.

Simon, Herbert, *Administrative Behavior* (3rd ed.), New York: The Free Press,1976.

Simon, Herbert A. “A Behavioral Model of Rational Choice.” *Quarterly Journal of Economics* 69: 1955,99-118.

২.৯ নির্বাচিত পাঠ

ঘোষ, সোমা, *জনপ্রশাসন-তত্ত্ব ও প্রয়োগ*, কলকাতা, প্রগ্রেসিভ প্রকাশনা, ২০১০।

বসু রাজশ্রী, *জনপ্রশাসন*, কলকাতা, রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০০৫।

সোম, সুভাষ, *জনপ্রশাসন*।

বসু, রুমকী ও চট্টোপাধ্যায়, পঞ্চানন, *জনপ্রশাসন*।

চক্রবর্তী, দেবাশীষ, *গণপরিচালন*।

একক-৩ ❑ উন্নয়ন প্রশাসন—এফ. রিগ্‌স

গঠন

৩.১ উদ্দেশ্য

৩.২ উন্নয়ন প্রশাসনের ভূমিকা

৩.৩ উন্নয়ন প্রশাসনের অর্থ

৩.৪ উন্নয়ন প্রশাসনের উৎস

৩.৫ উন্নয়ন প্রশাসনের ধারণা

৩.৫.১ এফ. রিগ্‌স

৩.৬ শেষ টীকা

৩.৭ নমুনা প্রশ্নাবলী

৩.৮ নির্বাচিত পাঠ

৩.১ উদ্দেশ্য

এই পাঠের উদ্দেশ্যগুলি হল—

- উন্নয়ন প্রশাসনের অর্থ ব্যাখ্যা করা।
- ঐতিহ্যবাহী এবং উন্নয়ন প্রশাসনের পার্থক্য নিরুপণ করা।
- উন্নয়ন প্রশাসনের বিবর্তন অনুসন্ধান করে বার করা।
- এর বৈশিষ্ট্যগুলির ওপর আলোকপাত করা।

৩.২ উন্নয়ন প্রশাসনের ভূমিকা

কার্যকারিতা ও মূল বক্তব্যের প্রেক্ষিতে ঐতিহ্যবাহী প্রশাসনিক তত্ত্বের বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এটি নিয়ম ও ক্রমোচ্চস্তর বিন্যাসের প্রতি কঠোর আনুগত্যের দ্বারা সীমাবদ্ধ। উন্নয়ন প্রশাসন নীতি এবং কর্মসূচিগত ধারণা, প্রশাসনিক মূল্য এবং পরিস্থিতির উপর আলোকপাত করে, যেগুলি একটি জাতির উন্নয়নের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। এটি সমাজের আর্থ-সামাজিক ও আর্থ-রাজনৈতিক উন্নয়নের দিকেও দৃষ্টি নিবন্ধ করে এবং খুঁজে বের করে দক্ষ আমলাদের। উন্নয়ন প্রশাসনের এই পরিকল্পনায় আমলাতন্ত্র সরকারের একটি হাতিয়ার, যেটি তৃণমূল স্তরে সম্পদের বণ্টনের ক্ষেত্রে দায়বদ্ধ থাকে। এই কাজ করতে গিয়ে তারা ঝুঁকি নিতেও প্রস্তুত থাকে এবং এই কাজের ক্ষেত্রে তারা উদ্ভাবনমূলক দৃষ্টি নিয়ে এগোতে থাকেন। বিশেষত একটি জাতি যখন উন্নতির দিকে যায় তখন আমলাতন্ত্রকে এই দায়বদ্ধতা নিতে দেখা যায়। উন্নয়ন প্রশাসন বর্তমান অবস্থা বাতিল করে দেয় এবং পরিবর্তনের নতুন দিক

নির্দেশ করে যা আরও বেশি ফল ও লক্ষ্য অভিমুখি হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সচলতা রয়েছে এবং নতুনকে অনুপ্রেরণা দিতে থাকে। এটি লক্ষ্য পূরণের উপযুক্ত পন্থা খুঁজে পেতে চায়। পাশাপাশি এটি মানুষের সঙ্গে থেকে মানুষের জন্য পরিকল্পনার ওপর আলোকপাত করে থাকে। এটি মানুষকেন্দ্রিক, সামগ্রিকভাবে সমাজের ক্ষমতায়ন কেন্দ্রিক, উৎপাদন বা লাভকেন্দ্রিক নয়।

উন্নয়ন প্রশাসনের নির্যাস হল সুসংহতভাবে পরিবর্তন আনা এবং সুনির্দিষ্টভাবে সরকারি কাজ সম্পন্ন করা। সাম্প্রতিক অতীতে অধিকাংশ উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের সরকার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করেছে এবং গুরুত্ব দিয়েছে উন্নয়নের ওপর যেখানে জন অংশগ্রহণ এবং পরিকল্পিত পরিবর্তন প্রাধান্য পাচ্ছে। সরকারের জনকল্যাণমূলক কাজের বৃদ্ধির ফলে ঐতিহ্যবাদী প্রশাসনিক তত্ত্বের সীমাবদ্ধতাগুলিকে সামনে এনেছে। সরকার তার ক্ষমতা অনুযায়ী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গঠন ও আচরণের পরিবর্তন আনতে তৎপর, কেননা প্রতিষ্ঠানের এবং সরকারের বিভিন্ন অংশের এই পরিবর্তনের ফলে সাধারণ মানুষের কাছে তার গ্রহণযোগ্যতা বাড়ে। এইভাবে উন্নয়ন প্রশাসনের অর্থ, বৈশিষ্ট্য এবং উৎসের অধ্যায়নের মাধ্যমে বিষয়টির ওপর দৃষ্টি নিবন্ধ করা হয়।

৩.৩ উন্নয়ন প্রশাসনের অর্থ

Riggs-এর মতে উন্নয়ন প্রশাসন হল, প্রশাসনিক উন্নয়ন কর্মসূচীর পদ্ধতিগুলির ব্যবহার—যা ব্যাপকভাবে সংগঠনের দ্বারা করা হয়ে থাকে। সরকার নীতিগুলিকে কার্যকরী করে এবং পরিকল্পনা রচনা করে উন্নয়নের লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য। এ সম্পর্কে বলা যায়, এটি কার্য, লক্ষ্য, পরিবর্তন অভিমুখী প্রচেষ্টা যা পরিকল্পনা নীতি ও কর্মসূচীর ওপর গুরুত্ব দেয়। জাতি গঠন ও আর্থসামাজিক উন্নয়ন যার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। আমলাদের বুদ্ধিমত্তা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে আর্থসামাজিক লক্ষ্যে পৌঁছানোই এর মূল উদ্দেশ্য। উন্নয়ন প্রশাসনে মানুষের জন্য পরিকল্পনা বা Planning for people-র চেয়ে মানুষের সঙ্গে পরিকল্পনা বা Planning with people-কে কেন্দ্রবিন্দুতে রাখা হয়েছে। এটি অবশ্যই উৎপাদন কেন্দ্রিকতার থেকে অনেক বেশি মানুষকেন্দ্রিক। এটি সর্বোচ্চ উৎপাদন এবং পরিসেবার কথা বলে না কিন্তু মানুষের প্রয়োজনীয়তা ও ক্ষমতার ওপর গুরুত্ব দেয়।

উন্নয়ন প্রশাসনের কোন সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা নেই। তথাপিও উন্নয়ন প্রশাসনের বৈশিষ্ট্য ও চরিত্রের ওপর আলোকপাত করে এর অর্থ বোঝার চেষ্টা করা হয়। উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের সরকারের অবিচ্ছেদ্য কাজ ও লক্ষ্য হল উন্নয়ন। এই সকল রাষ্ট্রে মানব ও বস্তু সম্পদের প্রবল অভাব রয়েছে। এখনে ধরে নেওয়া হয় যে উন্নয়নের সবচেয়ে উপযোগী উপায় বা নতুন কোন উপায় challenge-এর সম্মুখীন হবে। তাহলেও উন্নয়ন প্রশাসন উন্নয়নের উপায়ের কথা বলে যা উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের সরকারের গুণগত ও পরিমাণগত পরিবর্তন করতে পারে। Weidner প্রথম উন্নয়ন প্রশাসনের বর্ণনা করেন। Riggs, Heady, Montgomary, Gant, Pai Panandikar প্রমুখ নিজস্ব পদ্ধতিতে এর ব্যাখ্যা দানের চেষ্টা করেছেন। যাইহোক উন্নয়ন প্রশাসনের গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা এবং অর্থ হল এই যে, এটি হল একটি প্রচেষ্টা যা পরিকল্পিত অর্থনৈতিক রূপান্তরের সঙ্গে সম্পর্কিত। এটি কেবল প্রশাসনিক ক্ষেত্রেই নয়, নীতি তৈরির সঙ্গেও সম্পর্কিত। যেটি উন্নয়ন—অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজ-সাংস্কৃতিক সমরূপ পরিবর্তনে সচেষ্ট হয়। রাষ্ট্র তার প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে থাকে। এইভাবে উন্নয়ন প্রশাসন কার্য অভিমুখী হয়ে থাকে এবং প্রশাসন কেন্দ্রীয় ভূমিকা নিয়ে উন্নয়নের উদ্দেশ্যকে সহজ উপায়ে কার্যকরী করে।

৩.৪ উন্নয়ন প্রশাসনের উৎস

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত রাষ্ট্রগুলি, যারা উপনিবেশিক শোষণ থেকে স্বাধীনতা লাভ করেছিল, সেই দেশগুলি দ্রুত রাষ্ট্র ও সমাজ পুনর্গঠনে জটিলতার সম্মুখীন হয়। এই সমস্ত নতুন রাষ্ট্রগুলির সামনে উন্নয়নের প্রশ্নে একাধিক চ্যালেঞ্জ আসে। এগুলি হল—দারিদ্র, অশিক্ষা, রোগ, কৃষির ক্ষেত্রে কম উৎপাদন এবং শিল্পজাত উৎপাদন ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার রাষ্ট্রগুলিকে বাদ দিয়ে উন্নয়ন প্রশাসনের ধারণা প্রচলিত ছিল। আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়া যা রাষ্ট্র প্রণীত উন্নয়ন প্রশাসনের ধারণার দ্বারা প্রভাবিত ছিল তা ঔপনিবেশিতাবাদের পরবর্তী কালে সূচিত হয়।

ঔপনিবেশিক বৈদেশিক শাসনের হাত থেকে মুক্ত হবার পর এই সমস্ত রাষ্ট্রগুলির দেশীয় জনগণ বিভিন্ন সমস্যা যেমন কর্মহীনতা, দারিদ্র, অব্যবস্থা, অনাহার এবং রোগের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল। এই সমস্ত রাষ্ট্রে সম্পদ ও মানব সম্পদের অভাব ছিল এবং কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে উন্নতি ছিল যৎসামান্য। এছাড়াও এ সকল রাষ্ট্রগুলির ব্যক্তিগত উদ্যোগগুলিও রাষ্ট্রীয় উন্নয়নের দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত ছিল না। এই কারণে এই সমস্ত রাষ্ট্রগুলির সরকার সর্বাত্মক ও সমজাতীয় পরিকল্পনার দ্বারা সুসংহত উন্নয়নের দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নেয়। রাষ্ট্রীয় রূপকারদের লক্ষ্য ছিল শিল্পায়ন, স্বনির্ভরতা, সামাজিক ন্যায় এবং অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ও আধুনিকীকরণের মাধ্যমে রাষ্ট্রের উন্নয়ন। এক্ষেত্রে উপলব্ধি করা হয়েছিল যে উন্নয়নের পাশ্চাত্য পদ্ধতি ভারতবর্ষের মত উন্নয়নশীল দেশগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

পাশ্চাত্য রাষ্ট্রগুলি ইতিমধ্যে উন্নয়নের একটি পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। কারণ তাদের শক্তিশালী আমলাতন্ত্র, তাদের সমস্যা ও পৃথক প্রকৃতি এবং তাদের সম্পদও প্রচুর। ভারতবর্ষের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলির সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি এবং সাংস্কৃতিক অবস্থান এক না হওয়ায় পশ্চিমী উন্নয়নের মডেল এক্ষেত্রে সহায়ক নয়। এই কারণে এ কথা ভাবা হয়েছিল যে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে বিকল্প প্রশাসনিক ব্যবস্থার নীতি গ্রহণ করা প্রয়োজন। বৃহত্তর আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার অংশ হিসেবে এই মডেল দেখা দিয়েছিল এবং প্রতিষ্ঠা করেছিল পরিবেশ ও প্রশাসনের মধ্যে নির্দিষ্ট সম্পর্ক। উন্নয়নকে দেখা হয় সামগ্রিকভাবে। যেমন শিল্প, কৃষি, প্রযুক্তি, সামাজিক সংস্কৃতি এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নয়ন। এই ভাবে উন্নয়ন প্রশাসনের একটি নতুন ধারণার আবির্ভাব হয় যেখানে জনগণের অংশ গ্রহণের উপর জোর দেওয়া হয়। এবং পরিকল্পিত পরিবর্তনকে সমর্থন করা হয়। রুজভেল্টের সময় মার্শাল পরিকল্পনার এবং নিউ ডিল কর্মসূচির মধ্যে টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রাম তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির প্রশাসনের উপর প্রভাব ফেলতে ব্যর্থ হয়েছিল। বাস্তব ক্ষেত্রে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি পরিবর্তনের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ ও প্রয়োগ করে। এই উপলব্ধি উন্নয়ন প্রশাসনের ধারণার জন্ম দেয়। সমতা ও ন্যায় বিচারের দাবি তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে উন্নয়ন সম্পর্কে জানতে ও বুঝতে নতুন করে উৎসাহ যোগিয়েছে। সেজন্য উন্নয়ন বলতে একটি সার্বিক শব্দ বোঝাতে যা অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক অর্থকে ইঙ্গিত করত। এইভাবে এটি ছিল এমন একটি প্রক্রিয়া যার উদ্দেশ্য কেবল মাত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নই ছিল না বরং সার্বিক জনকল্যাণের পথও উন্মুক্ত করেছিল। এর ফলে উন্নয়নের অর্থ পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং উন্নয়ন আনার জন্য প্রক্রিয়াগুলির পিছনের চিন্তা ধারাও

পরিবর্তিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় উন্নয়নশীল দেশগুলির উন্নয়নের জন্য তাদের নিজস্ব অভ্যন্তরীণ সম্পদ, প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং প্রযুক্তির উপর জোর দেওয়া উচিত। এইভাবে উন্নত দেশগুলির উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে নিজস্ব ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব দিয়ে সকল মানুষের সহযোগিতায় উন্নয়ন প্রক্রিয়া সাধিত হওয়া উচিত। সুতরাং পরিকাঠামো শিল্পোন্নয়ন শিক্ষা ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ ইত্যাদি বিষয়ের অভাবকে এই পরিস্থিতিতে কেবল মাত্র আংশিক ভাবে দায়ী করা যায়। সে জন্য রাজনীতিবিদ্, প্রশাসক, গবেষকরা ঐক্যমত পোষণ করেছিলেন যে জনপ্রশাসনের সমস্যাগুলিকে ভিন্ন ভাবে আলোকপাত করতে হবে। তারা জনপ্রশাসন বিষয়ক একটি নতুন ধারণা, উন্নয়ন প্রশাসনের জন্ম দিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে উন্নয়নের লক্ষ্যে কঠোরনীতি থেকে উদরনীতি বা আইনী কঠোর প্রশাসনিক নীতি জারি রাখার বদলে সাধারণ সুবিধাগুলি, সার্বিক জনকল্যাণকর নীতিগুলি ছড়িয়ে দেওয়ার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ এই প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য ছিল প্রশাসনিক উৎসাহের উপর গুরুত্ব দেওয়া, যার ফলে সরাসরি উন্নয়ন ও পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করা যাবে। এইভাবে জনপ্রশাসনের বিশ্লেষণে উন্নয়ন একটি অন্যতম বিষয় হয়ে উঠল। এডওয়ার্ড ওডেনারের মতে (যিনি ছিলেন এই তত্ত্বের জন্মদাতা), ভিন্ন প্রশাসনিক ব্যবস্থা, ভূমিকা, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাকে এক সাথে সম্পৃক্ত করে, উন্নয়নের সর্বোচ্চস্তরে নিয়ে যাওয়াই এই তত্ত্বের উদ্দেশ্য। রমেশ কে. অরোরা সহমত পোষণ করে বলেছেন যে এই তত্ত্ব তৈরি হয়েছে এটি বুঝতে যে, কীভাবে জনপ্রশাসন বিভিন্ন পরিবেশে নিজেকে পরিবর্তন করে সামাজিক উদ্দেশ্যগুলিকে সাধিত করতে পারে।

এইভাবে উন্নয়ন প্রশাসনের মূল গুরুত্ব প্রতিফলিত হয়েছিল অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে আধুনিকতাকে উন্নীত করার প্রতি। সরকারী কাজের উদ্দেশ্য ছিল অর্থনৈতিক জীবন, গণতন্ত্র, সুরক্ষা ও শিল্পায়নের উপর গুরুত্ব দিয়ে সনাতন প্রান্তিক অঞ্চলগুলিকে সরকারী আমলাতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণে আনা। উন্নয়ন প্রশাসনের তত্ত্বটি প্রচলিত হয়ে উঠেছিল কেননা এটি শান্তি প্রক্রিয়ার রক্ষণাবেক্ষণের উপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে, উন্নয়নের বিভিন্ন দায়িত্বগুলোর উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিল, বিশেষ করে মানব উন্নয়ন ও বৃদ্ধির উপরে। এই পরিবর্তন স্থির করে দেয় যে প্রশাসন মূলত পরিবর্তনশীল এবং সাধারণ মানুষের কল্যাণের স্বার্থে সাহায্য করে। ক্যাডিন শব্দটিতে নিহিত আছে উন্নয়ন হল কাঙ্ক্ষিত, যে পরিকল্পিতভাবে প্রশাসন ব্যবস্থার উন্নয়নের ধারণাকে গ্রহণ করতে পারে। এর মাধ্যমে অসাম্য এবং সামাজিক উৎপাদনের পরিমাণের ক্ষেত্রে যে বাধা তা থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করবে এবং সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে সকল বড় বাধা তা সমাধান করা যাবে। কারণ মানুষের কাছে অবশ্যম্ভাবী এবং বাধ্যতামূলকভাবে প্রয়োজন। উন্নয়ন প্রশাসন এই ধরনের বাস্তবতার সাথে যুক্ত মানুষের সমস্যার বাস্তব সমাধানের সাথে যুক্ত আছে। মানুষের বাস্তব জগতের বিকশিত উদ্দেশ্য নিহিত আছে উন্নয়ন প্রশাসনের ধারণায়। যেটি গুণগত ও পরিমাণগত আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের মাধ্যমে আধুনিকীকরণের সাথে পরিচয় ঘটায়।

একচেটিয়া ভাবে উন্নয়ন প্রশাসনের ধারণা ব্যবহার করা হয়েছে এশিয়া আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার মত উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলির জন্য। ঔপনিবেশিকতাবাদের পরে উন্নয়ন প্রশাসনের ধারণা আর্থ সামাজিক পরিবর্তনের পদ্ধতি রূপান্তরের ক্ষেত্রে সচেষ্ট হয়েছে। ব্যাপকভাবে বলা যায় যে উন্নয়ন প্রশাসনকে সংজ্ঞায়িত করার ক্ষেত্রে দুধরনের মতবাদ আছে। এক ধরনের মতবাদের প্রতিনিধিত্ব করছেন লুসিয়ান পাই, ফ্রেড রিগস্ এবং ওয়াইডনার। এরা উন্নয়ন প্রশাসন শব্দটিকে ব্যপক অর্থে ব্যবহার করেছেন। এই মতানুসারে কোনো সংগঠন কীভাবে অর্থনৈতিক সামাজিক অগ্রগতির দিকে এগিয়ে যাবে সে বিষয়ে উন্নয়ন প্রশাসন সহায়তা করে। এই ধারণা অনুসারে মনে করা

হয় যে রাষ্ট্র গঠনের সমগ্র পদ্ধতি উন্নয়ন প্রশাসনের অন্তর্ভুক্ত। এই মতবাদ অনুসারে বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলির জনপ্রশাসনের অধ্যায়নের ক্ষেত্রে এই ধারণাটি একটি সুসঙ্গবন্ধ রূপ পেয়েছে। সংক্ষেপে বলা যায় যে উন্নয়ন প্রশাসন একটি অতি প্রয়োজনীয় ধারণা। প্রশাসনের ক্ষেত্রে এটি যতটা না কাঠামো মূলক, তার থেকে অনেক বেশি ক্রিয়ামূলক। যখন এটি সনাতন এবং নিয়ম মাফিক প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত থাকে তখন প্রশাসনের গতিশীলতার উপর জোর দেয়। যেখানে পরিকল্পনা ও প্রয়োগ ক্ষমতার একটি হাতিয়ার হিসেবে এই দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যায়ন করে। উন্নয়ন প্রশাসন নতুন সংস্থাগুলির সংগঠন অথবা প্রতিষ্ঠিত সংস্থাগুলির নির্মাণ নিয়ে আলোচনা করে। অভ্যন্তরীণ প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্বমূলক কাঠামো এবং ক্রমোচ্চ স্তরবিন্যাস ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত থাকে—একথাও পৃথকভাবে বলা যায়।

উন্নয়ন প্রশাসনের কর্মসূচি বা উন্নয়নমূলক উদ্দেশ্য পরিবেশনের ক্ষেত্রে জড়িত এমন সব চিন্তা বা প্রকল্পকে বোঝায় যা সংগঠিত প্রচেষ্টার ফল। এটি এমন একটি পর্যায় যেটি নিজ নিজ কর্মসূচি বাস্তবায়নের সংগঠিত প্রচেষ্টা। উন্নয়ন প্রশাসনের সঙ্গে জড়িত বিষয়গুলি হল কৃষি, শিক্ষা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন এবং সামাজিক কল্যাণ যা প্রশাসনের বিকাশের সঙ্গে সম্পর্কিত। তবে শব্দার্থিক অর্থে উন্নয়ন পরিচিত কর্মসূচি প্রকাশে বিশেষ অধরা অর্থ বহন করে। উন্নয়নশীল দেশগুলির উন্নয়ন বলতে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় চাহিদা অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে। এখানে উন্নয়ন বলতে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, মূলধন ও ভোক্তাদের পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি—এই অর্থে বোঝানো হয়। উন্নয়নের অপরিহার্য ধারণা হল মানুষের এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশের রূপদানকারী মানব সমাজের উপর গুরুত্ব দান। অন্যভাবে বলা যায় উন্নয়নের জন্য সমষ্টিগত সিদ্ধান্ত, যা সামাজিক কর্মের জন্য প্রস্তাব প্রণয়ন এবং সহমতের ভিত্তিতে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে শেখায়।

বিস্তারিতভাবে আলোচনা করলে বলা যায় উন্নয়ন প্রশাসনের সংজ্ঞা ও সুযোগ সংক্রান্ত আলোচনার দুটি দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। লুসিয়ান পাই (Lucian Pye) ফ্রেড রিগস্ (Fred Riggs) এবং অয়েডনার (Weidner) দ্বারা প্রতিনিধিত্বকারী গুরুত্বপূর্ণ একটি দৃষ্টিভঙ্গী বোঝায়, যেখানে একটি বৃহত্তর অর্থে উন্নয়ন শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। উন্নয়ন প্রশাসন বলতে এমন একটি প্রতিষ্ঠানের পথ নির্দেশ প্রক্রিয়াকে বোঝায় যা কর্তৃত্বমূলক ভাবে একটি পদ্ধতির সাহায্যে বা অন্য নির্ধারিত প্রগতিশীল রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক উদ্দেশ্যে মহৎ উন্নয়নমূলক কাজ সম্পাদন করে থাকে। এই অর্থে বলা যায় উন্নয়ন প্রশাসনকে বিশেষ করে বিশ্বের উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে জাতি গঠনমূলক সমগ্র প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত করা। এই সংজ্ঞা উন্নয়ন প্রশাসন, জনপ্রশাসনের অধ্যায়নের জন্য একটি সমন্বিত ধারণা হয়ে যায়। সংক্ষেপে বলতে গেলে এটি উন্নয়ন প্রশাসন যা ভিত্তির কাঠামোর চেয়ে ভিত্তির কর্মের উপর গুরুত্ব দেয়। এটি প্রশাসনের একটি ঐতিহ্যগত এবং নিয়মমাফিক চর্চা, যা পরিকল্পনার কার্যকর করার একটি দলিল হিসেবে তার ক্ষমতা বিচার করে। উন্নয়ন প্রশাসনের আলোচনায় উন্নয়ন প্রশাসন ও প্রশাসনের ধারণার মধ্যে পার্থক্য বুঝে নেওয়া দরকার। পাশাপাশি উভয়রূপ ধারণার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়টাও জানা দরকার।

উন্নয়ন প্রশাসনের নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য হল

১। পরিকল্পনার সকল স্তরে নতুনত্ব।

২। তৃণমূল পর্যায়ে উন্নয়নের উপর গুরুত্বদান।

৩। একটি সম্পদ হিসেবে মানব সম্পদের উন্নয়ন।

সমাজে দ্রুত পরিবর্তন স্থাপন এবং ন্যায় ও স্বতন্ত্র সামাজিক শৃঙ্খলা আনার জন্য রাজনীতি ও প্রশাসনকে হাতে হাত রেখে কাজ করতে হবে। তাছাড়া প্রাকৃতিক সম্পদকে সবচেয়ে কার্যকরীভাবে ব্যবহার করতে হবে। এক্ষেত্রে দক্ষতাকে গুরুত্ব দিতে হবে এবং প্রশাসকদের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা অপরিহার্য বলে বিবেচনা করতে হবে। কার্যকর উন্নয়ন প্রশাসনিক কাজের জন্য প্রশাসনের উপর দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে চাপ বজায় রাখা। এখানে ক্ষমতা প্রাপ্ত একটি প্রশাসনিক সংগঠন আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন করতে সক্ষম, যা ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান বা পদ্ধতির চেয়ে অনেকটাই পৃথক। এটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনে। যার মাধ্যমে প্রশাসনিক ব্যবস্থার বিকাশ ঘটে।

গণ-প্রশাসনিক উন্নয়নের সংক্ষিপ্ত সার

১। ক্ষমতা তৈরির জন্য গৃহীত সিদ্ধান্ত

২। দক্ষতা এবং বিশেষায়িত উন্নয়ন প্রশাসনিক কর্মীদের জটিল সমস্যার মোকাবিলা করা।

৩। গুরুত্ব সহাকারে প্রশিক্ষণ নেওয়া।

৪। প্রযুক্তির কার্যকরী ব্যবহার এবং প্রশাসনিক পদ্ধতির মধ্যে পরিবর্তন আনা।

৫। ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি।

৬। দুর্নীতির অপসারণ এবং আরো স্বচ্ছতা আনয়ন।

৭। উন্নয়ন উদ্যোগে প্রচারের জন্য আমলাদের উপর গুরুত্ব দান।

উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জন করার জন্য একটি সঠিক পরিকল্পনার রূপায়ণ জরুরী। এক্ষেত্রে সম্পদ, দক্ষ কর্মীদের সর্বোত্তম ব্যবহার প্রযুক্তির উপর গুরুত্বদান এবং কর্মচারীদের মধ্যে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রয়োজন। এই সময় আমলাতন্ত্রের হাতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া প্রয়োজন, যা অবশ্যই বিকেন্দ্রীভূত হবে। প্রশাসনিক উন্নয়ন এবং উন্নয়ন প্রশাসন উভয়ই সমাজে কাজ করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং উন্নয়নের জন্য একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ বলে মনে করা হয়। উন্নয়ন প্রশাসনকে অবশ্যই ঐতিহ্যগত প্রশাসনিক ধারণা থেকে পৃথক করা প্রয়োজন।

১। ঐতিহ্যগত প্রশাসনে দৃশ্যত হয়েছে সরকারি ক্রিয়ার আইনি প্রয়োজনীয়তা ও সামাজিক স্থিতিশীলতার, যেগুলি নিয়ম ও শৃঙ্খলতার দ্বারা পরিচালিত। ঐতিহ্যগত প্রশাসন আইন ও নির্দেশের রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখে। রাজস্ব সংগ্রহ ও জাতীর জীবনের বিধিগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে, যেগুলি বিধিবদ্ধ রয়েছে। নতুন উদ্ভুত রাষ্ট্রগুলির জন্য প্রশাসনের পরিবর্তনের প্রয়োজন সেগুলি আইন ও মূল্যের নির্দেশে থেকে উন্নয়নের মূল্যে রূপান্তরিত হবে। উন্নয়ন প্রশাসনের গুণগত লক্ষ্য হল মানুষের সমর্থিত, মানুষের জন্য পরিকল্পনা যেটি ঐতিহ্যগত প্রশাসনের সংকীর্ণ দৃষ্টি থেকে পৃথক করে। ঐতিহগ্যগত প্রশাসন গুণগত লক্ষ্যের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করে। এবং নিয়মের কার্যকারীর মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখে।

২। উন্নয়ন প্রশাসন সম্পর্কে আরো বলা যায় এটি কোন আবদ্ধ ব্যবস্থা নয়, বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন এবং তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে এটি একটি মুক্ত ব্যবস্থা। উন্নয়ন প্রশাসনের অধীনে থাকা স্থানীয় প্রশাসনের এককগুলি কেন্দ্রীয় কাঠামো থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

৩। যদিও সেখানে সব ধরনের পরিকল্পনার ক্ষেত্রে কারিগরী ও আচরণগত প্রণালী একই ধরনের উন্নয়ন প্রশাসনের ক্ষেত্রেও বাহ্যিক সম্পর্ক অপ্টিমাইজ করা হয়েছে।

৪। ঐতিহ্যগত প্রশাসনের বিপরীত উন্নয়ন প্রশাসন, মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গী এবং পদ্ধতির পরিবর্তে প্রণালী এবং গঠনের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়।

উভয় ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য আইনশৃঙ্খলার রক্ষণাবেক্ষণ হল প্রাথমিক কাজ। কিন্তু উন্নয়ন প্রশাসন সামাজিক অবস্থান বজায় রাখার জন্য নিজেকে একটি লক্ষ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে না।

৩.৫ উন্নয়ন প্রশাসনের ধারণা

উন্নয়ন প্রশাসনে নির্দিষ্ট রয়েছে—

১। **পরিবর্তন অভিমুখী :** উন্নয়ন প্রশাসনের প্রথম ও প্রধান উপাদান হল তার পরিবর্তনশীলতা। উন্নয়ন প্রশাসনের দার্শনিক মূল্যের অংশ হিসাবে পরিবর্তনের স্থান রয়েছে। এখানে শৃঙ্খলা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যেখানে বৃদ্ধি এবং বণ্টনমূলক ন্যায়ের কথা বলা হয়েছে। পাই পানান্দিকর উল্লেখ করেছেন যে উন্নয়ন প্রশাসনের কেন্দ্রীয় বিষয় হল আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন। উন্নয়ন প্রশাসনবদ্ধ হতে পারে না। এটি একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতির ইতিবাচক পরিবর্তন করে। এই পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রশাসনের গঠনগত পরিবর্তন এমনভাবে হয় যার মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি, বেকারত্ব এবং দারিদ্র্য দূর করা যায়। এই নতুন পরিকল্পনায় কর্মী ও নিয়োগকর্তার মধ্যে সম্পর্কের উচিত ঘটে না উন্নয়ন প্রশাসনের আবশ্যিক অংশ।

২। **লক্ষ্যাভিমুখী :** উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলি দরিদ্র, সম্পদের অসম বণ্টন, কৃষির অনুন্নতি, প্রযুক্তিগত অভাবের মতো সমস্যার সম্মুখীন। সুনির্দিষ্ট অগ্রাধিকার ও লক্ষ্যের মাধ্যমে এই সকল বহু বিবিধ বিষয়গুলিকে সুশৃঙ্খলভাবে সমাধান করা উচিত। উন্নয়ন প্রশাসনে উন্নয়নের মূল লক্ষ্য হল সামাজিক ন্যায়বিচার, আধুনিকীকরণ, শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত করা।

৩। **উদ্ভাবনী প্রশাসন :** উন্নয়ন প্রশাসন বিদ্যমান শাসন কাঠামোর আকৃতির ওপর দৃষ্টিনিবন্ধ করে এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশের প্রেক্ষিতে নিয়মের পরিবর্তন করে। অন্য অর্থে উন্নয়ন প্রশাসন হল চলমান ও প্রগতিশীল ভাবনা ও ক্রিয়া। এটি নয়া কাঠামো, পদ্ধতি, প্রক্রিয়া, কৌশল, নীতি, পরিকল্পিত প্রকল্প এবং কর্মসূচি নির্ধারণে উৎসাহী। উন্নয়ন প্রশাসন পূর্ব নির্ধারিত উন্নয়ন উদ্ভাবনী ক্ষমতায় বিশ্বাসী। IRDP, TRYSEM, NREP, DWACRA, উপজাতি উন্নয়ন কর্মসূচি ইত্যাদি হল ভারতের সাবেকি উন্নয়ন কর্মসূচির অংশ। এই উদ্ভাবনী কর্মসূচীর মূল লক্ষ্য হল বেকারত্ব এবং দারিদ্র্য দূর করা এবং কাজের ক্ষেত্র তৈরি করা। কয়েকটি উন্নয়ন সংস্থা যেমন—জেলা গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থা, জেলা পরিকল্পনা শাখা, রাজ্য পরিকল্পনা বোর্ড, সমবায় প্রভৃতি উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করছে এবং এই সকল প্রতিষ্ঠানগুলি ভারতীয় প্রশাসনকে মানুষের প্রয়োজনীয়তার প্রতি দায়বদ্ধ হওয়ার শিক্ষা দিচ্ছে যার মাধ্যমে একটি ভাল প্রশাসনের ধারণা তৈরি করা যায়।

৪। **উপভোক্তা কেন্দ্রিক প্রশাসন :** উন্নয়ন প্রশাসনের নির্দিষ্ট অভিমুখটি হল—যারা প্রান্তিক কৃষক, ভূমিহীন

শ্রমিক এবং গ্রামীণ ভারতীয়, তাদের চাহিদা পূরণ করা। উন্নয়ন প্রশাসকদের দ্বারা এই শ্রেণির মানুষদের আর্থ-সামাজিক এবং আর্থ-সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ঘটাবে যা তাদের কাছে আবশ্যিক। একাধিক নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা লাভবান গোষ্ঠীকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়েছে যারা এই প্রান্তিক মানুষদের বিভিন্ন সহায়তা করে থাকে। এটি পরামর্শ দেয় যে উন্নয়ন প্রশাসন হল মানবকেন্দ্রিক যা তাদের প্রয়োজনীয়তাকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। প্রয়োজনে কর্মসূচীর পরিবর্তন আনে, নীতির পরিবর্তন ঘটায় যা এই শ্রেণির মানুষের জন্য আবশ্যক। এই ধরণের প্রশাসন অবশ্যই দুর্বল ও অবহেলিত মানুষের উন্নতির সাথে যুক্ত থাকবে।

৫। **অংশগ্রহণ কেন্দ্রিক প্রশাসন :** উন্নয়ন প্রশাসন সহযোগিতার নীতি এবং অংশগ্রহণমূলক প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে গ্রহণ করে থাকে। এখানে সাধারণ মানুষকে পার্শ্বগ্রাহক হিসাবে বিবেচনা করলে চলবে না। উন্নয়ন পরিকল্পনা ও তার বাস্তবিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের সক্রিয় ভূমিকা থাকা জরুরী। এটি স্বীকৃতি দেয় যে কেন্দ্রীভূত প্রশাসন, বাস্তবে স্থানীয় সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হবে না, যদি না স্থানীয় সম্পদ, শক্তিকে কাজে লাগানো হয়। অর্থাৎ, কার্যকরী পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তার প্রয়োগ স্থানীয় মানুষের ও প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় করা সম্ভব হয়। এটি সরকারের উন্নয়ন বিষয়ক শাসন এবং ব্যবস্থাপনায় মানুষের অংশগ্রহণ করার সঙ্গে সম্পর্কিত। ভারতে এই ধরনের উন্নয়ন কৌশল হিসাবে পঞ্চায়েতের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

৬। **কার্যকর সমন্বয় :** উন্নয়ন প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত একাধিক প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থাগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে, যাদের সংখ্যা পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে এরা অনেক বেশি বিশেষজ্ঞতার সহিত তাদের দায়িত্ব পালন করেছে। এই ধরনের ব্যবস্থায় সর্বাধিক লাভের জন্য প্রশাসনের বিভিন্ন এককগুলির সঙ্গে সমন্বয় থাকা বিশেষ জরুরি। সর্বাধিক ফল পাওয়ার জন্য সময় এবং সম্পদের অপচয় বন্ধ করতে হবে। উন্নয়ন প্রশাসন বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থাগুলির সঙ্গে যোগাযোগ তৈরি করে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতাগুলিকে একত্রিত করে উন্নয়নের লক্ষ্যে পৌঁছানোর চেষ্টা করে। এই কাজের মাধ্যমে প্রশাসনকে সমস্যা থেকে মুক্ত রাখতে সাহায্য করে, তাছাড়া অপ্রাসঙ্গিক, অপ্রয়োজনীয় কাজ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। এটা অবশ্যই প্রশাসনিক দুর্বলতাকে সঙ্কুচিত করে।

৭। **পরিবেশগত দৃষ্টিকোণ :** উন্নয়ন প্রশাসন পরিবেশ, রাজনীতি, সমাজ এবং অর্থনীতির দ্বারা প্রভাবিত হয় বা প্রভাবিত করে। এটি কোন আবদ্ধ ব্যবস্থা নয়। যেটি সমাজ ব্যবস্থা থেকে প্রেরণা গ্রহণ করে এবং দাবির মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া দেয়। উন্নয়ন প্রশাসন পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং প্রশাসন এবং পরিবেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সঙ্গে বোঝাপড়া রয়েছে। পরিবেশ উন্নয়ন প্রশাসনের সূচকের ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এটি বেশ সংবেদনশীল এবং নমনীয়। প্রশাসনিক পরিবর্তন পরিবেশের উপর প্রভাব ফেলে আবার পরিবেশের পরিবর্তন প্রশাসনকে প্রভাবিত করে।

উন্নয়ন প্রশাসন সরকারের মাধ্যমে কেবল শারীরিক, মানসিক এবং সাংস্কৃতিগত পরিবেশের পুনঃ কাঠামো রচনা করে না, সরকারের লড়াই করার ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করে। উন্নয়নের দৃষ্টি কোন থেকে বলা যায় সরকারের ক্ষমতা তৈরি করতে পরিবেশের কাঠামো সিদ্ধান্তকারির ভূমিকা নিয়ে থাকে। প্রত্যেক সরকারের উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমান

ক্ষমতা থাকে না। একটি সরকারের কাছে যেটি সহজ ব্যাপার অপর সরকারের কাছে তা সহজ নাও হতে পারে। উন্নয়ন প্রশাসনের সাফল্যের ক্ষেত্রে অর্থনীতি, রাজনীতি এবং প্রতিষ্ঠান নির্ধারকের ভূমিকা নিয়ে থাকে।

৩.৬ শেষ টীকা

➢ **রাজনৈতিক প্রেক্ষিত :**

আইনি সংস্থা, আদালত, রাজনৈতিক দল ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান এবং সাধারণ মানুষ সরকারের সাফল্য এবং ব্যর্থতার পিছনে ভূমিকা নিয়ে থাকে। তাদের মধ্যে জন আমলাতন্ত্র হল প্রধান উপাদান যে সরকারি কর্মসূচিকে বাস্তবায়িত করে। রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্র ক্রমোচ্চস্তর বিন্যস্ত হয়ে থাকে যেগুলি সাধারণ কর্তৃপক্ষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। একটি সরকার তখনি ফলপ্রসূ হয় যখন তার কর্মচারীদের পারফরম্যান্স ভালো হয়। উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে আমলাতন্ত্র এমন অনেক রাজনৈতিক কাজকর্ম করে থাকে যেগুলি তার করার কথা নয়। যার অর্থ আমলাতন্ত্র তার ক্ষমতার অপব্যবহার করে যার ফলে তারা নিজেদের মূল দায়িত্ব থেকে দূরে সরে যায়। রিগ্‌স দেখিয়েছেন প্রশাসনিক এবং পরিচালন মতবাদ আমেরিকাতে কতখানি প্রয়োজন। এবং অন্যান্য পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলিতে সীমিত পরিমাণে প্রয়োজন। একাধিক অ-পশ্চিমী রাষ্ট্রে ক্ষমতা ও আমলাতন্ত্রের মধ্যে ভারসাম্যের অভাব লক্ষ করা যায় এবং এই সকল জায়গাগুলিতে ক্ষমতাকে বিশেষভাবে ব্যবহার করা হয়। অন্য অর্থে প্রশাসনিক নীতি, ভারসাম্যের রাজনীতিতে প্রশাসনের পারফরমেন্স বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। এই ব্যবস্থায় ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। এই গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলিতে আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা বিশেষভাবে নির্ভর করে। রিগসের মতে কোনো রাষ্ট্রে আমলাতন্ত্র এবং সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থার মধ্যে ক্ষমতার বণ্টনের ক্ষেত্রে ভারসাম্য থাকা জরুরি। ঐতিহ্যবাদী প্রশাসনিক ধারণা সাহায্যকারীর এবং প্রাসঙ্গিকতার কারণে প্রয়োজন। রিগ্‌সের মতে ভারসাম্যযুক্ত রাজনৈতিক ব্যবস্থা কখনোই গণতন্ত্রের সঙ্গে সমার্থক নয়। এই ব্যবস্থা যেখানে উপস্থিত সেখানে একদলীয় ব্যবস্থা রয়েছে অর্থাৎ কমিউনিস্ট ব্যবস্থায় এটা সম্ভব অথবা যে ব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রণ করার অনীহা থাকে সেখানে এটি সম্ভব। একটি দল প্রাধান্যকারী ব্যবস্থায় অফিসিয়াল আমলাতন্ত্রের সঙ্গে ক্ষমতা বণ্টন করে নিতে পারে। রিগ্‌সের মতে গণতান্ত্রিক সরকারের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক বক্তব্য প্রাসঙ্গিক।

➢ **অর্থনৈতিক প্রেক্ষিত :**

বেতন ব্যবস্থা কর্মচারীদের কেবলমাত্র উৎসাহ প্রদানে সাহায্য করে না, কোন রকম চাপ দেওয়া থেকে বিরত থেকে অফিসিয়াল কাজ করতে সাহায্য করে। বেতন ব্যবস্থার মাধ্যমে মজুরী প্রদানের ব্যবস্থা কর্মচারীদের প্রয়োজনীয়তা মেটায়। যার অর্থ হল কর্মচারীদের বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় উপাদান এই বেতন থেকে পূরণ করা সম্ভব হয়। দায়িত্বশীল Pay-roll ব্যবস্থার মাধ্যমে মজুরী বণ্টন করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে ‘কর’ থেকে যে আয় হবে সেখান থেকেই এই অর্থ প্রদান করা হবে। অর্থাৎ বেতন ব্যবস্থা রাজার জন্য অর্থনৈতিক ভীত মজবুত থাকতে হবে এবং উৎপাদনের স্তর যথেষ্ট উঁচু মানের হতে হবে। প্রাথমিক উৎপাদনকারীদের প্রয়োজন মেটানো ছাড়া কর্মচারী গোষ্ঠীর প্রয়োজন পূরণ করার জন্য অর্থনৈতিক উৎপাদনের স্তর আরো উঁচু হতে হবে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পেশার সঙ্গে যুক্ত এবং যারা প্রাথমিক ও সাধারণ কর্মচারী বলে বিবেচিত হয় তাদের প্রয়োজন পূরণের জন্য এটা আবশ্যিক। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের সঙ্গে যুক্ত কর্মচারীরা জাতীয় আয় বাড়াতে সাহায্য করলেও একটি সমাজ তাদের সমস্ত

চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে না যদি না প্রাথমিক পর্যায়ে উপযুক্ত ভীত প্রস্তুত থাকে। এক্ষেত্রে কৃষি উৎপাদন গুরুত্বপূর্ণ। বৃহৎ আমলাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান এবং বিশেষ সরকারি শাখাগুলির জন্য প্রচুর খরচ করা হয়। এক্ষেত্রে বেতন ফালাফাল তৈরিতে বিশেষ ভূমিকা ন্যায়। দরিদ্র রাষ্ট্রগুলিতে কাজের সুযোগ অনেক কম, এখানে কৃষি মানুষকে ভরসা যোগায়। সরকারি কাজের জন্য চাপ ক্রমশ বেড়েছে, কারণ অর্থদক্ষ শ্রমিক পচুর পরিমাণে White colour কাজের চেষ্টা করছে। যারা official clarck হতে চায়। যে সমস্ত দেশে বিদেশি ব্যবস্থা রয়েছে, সেই দেশগুলিতে দেশীয় ও বিদেশি জনগণের জীবনযাত্রার মানের ক্ষেত্রে বিস্তর ফারাক রয়েছে, যা বড় ধরনের সমস্যার সৃষ্টি করছে। উপযুক্ত বেতন কাঠামো যুক্ত আর্থনৈতিক উন্নত রাষ্ট্রে আমলাতন্ত্র আইনি ব্যবস্থাকে ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে যা অর্থনৈতিক উপাদান বাড়ানোর মাধ্যমে রাষ্ট্রের উন্নয়নের সাহায্য করে। কিন্তু দরিদ্র দেশগুলিতে অনেক বেশি জটিলতা সৃষ্টি হয়।

উন্নয়ন প্রশাসনের আদর্শ রূপ : উন্নয়ন প্রশাসন প্রাথমিক অবস্থায় আর্থনৈতিক উন্নতি নিয়ে আলোচনা করত। যদিও এর উদ্দেশ্য হল সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং সকলের স্বাধীনতার ও সকলের সমান সুযোগের কথা বলা। ঘটনা হল এই যে বণ্টন, বিনিয়োগ অন্যান্য আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে সংস্থাগুলি অঙ্গীকারবন্ধ থাকে। এটি সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে সম্পদের সমরূপ বণ্টন সহায়তা করে। উন্নয়ন প্রশাসনের মূল দর্শন হল পিছিয়ে পড়া শ্রেণির মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া।

Chicago : 1961 American Society for Public Administration, রিগ্সের সভাপতিত্বে Comparative Administration Group (CAG) প্রতিষ্ঠিত হয়। উন্নয়ন প্রশাসনের বিশেষ সমস্যার ওপর আলোকপাত করার জন্য এটি গঠন করা হয়েছিল, যাকে Ford Foundation অর্থনৈতিক সাহায্য করেছিল। এই প্রতিষ্ঠানটি আর্থ-রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সংস্কৃতির সঙ্গে প্রশাসনিক ব্যবস্থার সম্পর্কের বিষয়ে আগ্রহী ছিল। এই গোষ্ঠী অনুভব করেছিল যে, তৃতীয় বিশ্বে ঐতিহ্যবাদী প্রশাসন জটিল, সংকীর্ণ যেটি মিশ্র সাংস্কৃতিক পরিস্থিতিকে বিশ্লেষণ করার অনুপযুক্ত। এটি প্রশাসনের আবে গগত আচরণ অযৌক্তিকতা ইত্যাদির বর্ণনা দিতে অক্ষম। Technological-managerial School পরিকল্পিতভাবে পরিবর্তন করার কথা বলে। কিন্তু Ecological School তাকে চ্যালেঞ্জ করে। এদের যুক্তি হল উন্নয়ন বিভিন্ন সামাজিক কাঠামোর সঙ্গে বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর সম্পর্কীকরণের ওপর উৎসাহ দেয়। এই ধারণা অনুসারে প্রশাসনের সামাজিক ভিত্তি প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের থেকে অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক। CAG-এর গবেষকরা তৃতীয় বিশ্বের রাজনৈতিক প্রশাসনের তুলনামূলক আলোচনা করতে উৎসাহ দিয়েছেন। এই গোষ্ঠী উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের জননীতির ওপর দৃষ্টি নিবন্ধ করেছেন বিভিন্ন সেমিনার, সম্মেলন বা কমিটি গঠনের মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠানটি তার কাজকর্মে রূপদান করেছিল। এই বিষয়ে যাদের প্রায় ৬১টি লেখা প্রকাশিত হয়েছিল।

১৯৬০-এর দশকে ফলাফলের মূল্যায়ন, সন্দেহ এবং পুরানো কৌশলগুলিকে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এসময় পুরানো কৌশলগুলিকে নিয়ে পথ চলতে চলতে নতুন ধারণা খোঁজা হয়েছে এবং ব্যাখ্যা করে নতুন পথ বের করার চেষ্টা হয়েছে, যেটি মিশ্র সংস্কৃতির বৈধতা দেবে। জনপ্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানগুলি উন্নয়নের বিকল্প পথের কথা বলে। তারা জনপ্রশাসন, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক সম্পর্কগত পরিবেশের কথা বলে। অন্যভাবে বললে জনপ্রশাসনে পরিবেশগত দৃষ্টিভঙ্গির আবির্ভাব ঘটে। এই ধরনের মতবাদের অন্যতম প্রবক্তা লেন ফ্রেড রিগ্স।

ফ্রেড রিগ্‌স উন্নয়ন প্রশাসনের তথাকথিত ধারণার তীব্র সমালোচনা করেছেন। তিনি তাঁর পর্যবেক্ষণে দেখেছেন মানুষের জীবনধারণের ক্ষেত্রে GNP-র বৃদ্ধির কোনো আবশ্যকতা নেই। তথাপিও মাথাপিছু আয় উন্নয়নের কোনো সূচক হতে পারে না। তিনি সূচক হিসাবে মানুষের দৈহিক গুণকে পছন্দ করতেন। তাঁর মতে উন্নয়নের ক্ষেত্রে মনস্তাত্ত্বিক এবং সামাজিক গুণ সূচকের ভূমিতে নিতে পারে। রিগ্‌স উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের সামাজিক এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থার, কাঠানো-কার্যবাদী বিশ্লেষণ করেছেন। এক্ষেত্রে Industria-transitia-agraria formulation-কে তিনি ব্যবহার করেছেন। তিনি উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলিকে Prismatic Society-র অন্তর্ভুক্ত করেছেন। যেটি Traditional Fused Society থেকে Modernity Defracted Society-কে কিভাবে রূপান্তরিত হয় তা নিয়ে আলোচনা করে। Ecological Approach প্রশাসনের সঙ্গে অপ্রশাসনিক বিষয়ের কী সম্পর্ক সে সম্পর্কে বিশ্লেষণ করে প্রতিক্রিয়া দেয়, যেটি এই দৃষ্টিভঙ্গির লক্ষ্য। একটি ধারণা আছে প্রশাসনিক দৃষ্টিভঙ্গি তার বিমূর্ত রূপের বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করতে পারে না যেখানে কার্যকারী আচরণ সাধারণ রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বকে অবজ্ঞা করে। এখন পর্যন্ত আধুনিক একাধিক সমাজ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হয় ঐতিহ্যবাদী কাঠামো, পরিবার, ধর্ম, জাতপাতের দ্বারা। প্রকৃতপক্ষে এটি আর্থ-সামাজিক অনুশীলনকে ধরে রাখে। সুতরাং সমাজ-সংস্কৃতি এবং প্রশাসনিক উপাদান কৌশলগত ও সাহায্যকারী পরিকল্পনার প্রয়োগের সঙ্গে কিভাবে সম্পর্কিত তা বুঝতে সচেষ্ট হয়। একটি প্রাথমিক শক্তিশালীগোষ্ঠী রক্ষণশীলতায় বিশ্বাসী তখনই হয় যখন সুনির্দিষ্টতা, সময়, সতর্কতার মত উপাদানগুলি খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়।

উন্নয়ন প্রশাসনের অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি : ১৯৬০-এর দশকে নীতিমানবাচক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে রূপান্তর ঘটেছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি একটি নিয়মানুক অধ্যায়নের রূপদান করে যার মাধ্যমে জাতিপুঞ্জ এবং অন্য প্রতিষ্ঠানগুলির কৌশলগত বিষয়ে সাহায্য করে প্রতিষ্ঠান গঠনে ভূমিকা নেয়। বিভিন্ন ব্যবস্থার সমান্তরাল চরিত্র আছে, যার কাঠামো এবং কাজ বিশ্লেষণে ছিল এর মৌলিক একক। এতে নীতিমানবাচক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায়, এর মূল লক্ষ্য হল আদর্শ অথবা কমপক্ষে একটি ভালো প্রশাসনিক কাঠামোর কথা বলে। উড্রো উইলসন, এল ডি হোয়াইট, ফেয়ল, গালিক, টেলর এবং আরো অনেকে এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করেছেন। এর মধ্যে আমেরিকার অনুশাসনের প্রতিরূপের প্রতিফলন হয়েছিল তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলির মানুষের জন্য। এই তালিকায় একাধিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যার মধ্যে প্রতিবেদন কিংবা অধ্যায়ন রয়েছে যেগুলি বিশেষজ্ঞ, কৌশল সহায়ক কিংবা পশ্চিমী রাষ্ট্রের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রশাসকদের দ্বারা প্রস্তুত করা হয়েছে। সাধারণ অবস্থায় একটি আদর্শ কাঠামো রচনা এবং সমস্যাগুলিকে খুঁজে বের করে তার সমাধান করা। যার মাধ্যমে একটি বিশ্বজনীন পদ্ধতিকে চিহ্নিত করা যায়।

কিভাবে CAG উন্নয়ন প্রশাসনে অবদান রেখেছে তা বুঝে নেওয়া? :

১৯৬০-এর দশকের উন্নয়ন পদ্ধতির মূল্যায়ণ ৭০-এর দশককে প্রভাবিত করেছিল। ৭০-এর দশকে কেবল উন্নয়নের ধারণারই পরিবর্তন ঘটেনি, উন্নয়নের লক্ষেরও পরিবর্তন ঘটেছিল যেটি অনেক বেশি মানব প্রয়োজন কেন্দ্রিক ছিল। কিন্তু উন্নয়ন প্রশাসনের প্রতিরূপটি এই বিষয়গুলির পরিচিত হয়েছিল এবং নিয়মানুবর্তিক কার্যাবলীর মধ্যে এর বাস্তব পরিবর্তনের কৌশলগুলি লক্ষ্য করা গিয়েছিল। এই পরিবর্তন দৃষ্টিগোচর হয়েছিল উন্নয়ন প্রশাসনের অধ্যায়নের ক্ষেত্রে। জন প্রশাসনের এক মুখিনতার জন্যে একে পছন্দ করে। UNA দ্বিতীয় দশক ছিল উন্নয়নের সময়। এর প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছিল ১৯৬৯-এর Technical Assistance Programme-এর অন্তর্গত

International Development Commission-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী। এই প্রতিবেদনটি সুস্পষ্টভাবে তৈরি করা হয়েছিল। যেটি দৃষ্টি নিবন্ধ করেছিল ১৯৬০ সালের প্রশাসনের আধুনিকীকরণের ওপরে, যেখানে বর্ণনা করা হয়েছিল কৌশলগত পদ্ধতিকে, যা যুক্ত ছিল পশ্চিমি প্রশাসনিক সঙ্গে। সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির কাছে এর ব্যাবহারের মূল্যায়ন ও পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা ছিল। এই বিষয়টির ওপর আলোকপাত করেছিল সাধারণ মানুষ, যারা গরিব, কিন্তু সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে অনুপযুক্ত নয়। উন্নয়ন প্রশাসনের সমস্যাগুলি আবর্তিত হত সেইসব দেশের ওপর যারা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিকভাবে সুবিধা নিত এবং জোর দিত সামাজিক বর্ণনার ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ তত্ত্বের ওপর।

➢ রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি :

একাধিক গবেষক বর্ণনা করেছেন যে সামাজিক পরিবর্তনের গতিশীলতা পরিবর্তিত হয় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা যেটি খোঁজে রাজনৈতিক প্রশাসনিক সংস্থা এবং অর্থনৈতিক প্রশাসনের একতাকে। নিশ্চিত করে বলা হয়েছিল যে প্রশাসনিক প্রশ্ন হল রাজনৈতিক। রাজনৈতিক অর্থনৈতিক যে ধাঁচ তা প্রশাসনকে পরিবেশের সঙ্গে সংযুক্ত করতে চায়। এই ধাঁচ যেটা সম্পদের বণ্টন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিসীমার সঙ্গে যুক্ত এবং এটি 'প্রাতিষ্ঠানিক সংবিধান' ও অন্তর্বর্তী রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। মোহিত ভট্টাচার্যের মতে "রাজনৈতিক অর্থনীতির সনাতন পাঠের ধারার সঙ্গে তাত্ত্বিক গঠনগুলি সমাজের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক শক্তির পারস্পরিক সম্পর্ককে আবিষ্কার করে। রাজনৈতিক অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি "Good paradigm" এবং "Rational Model"-কে উল্লিখিত করে। এই নতুন ধারণাগুলি শক্তি এবং কাজের তত্ত্বকেই উল্লেখ করে। এই ধাঁচের গতি প্রকৃতি গঠিত হয় উন্নয়ন প্রশাসনের পরীক্ষা, দ্বন্দ্বগুলির প্রকৃতিগত পদ্ধতি এবং তাঁদের সংশ্লিষ্ট সংকল্পের মধ্যে দিয়ে। রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ধাঁচটি প্রশাসনিক প্রাসঙ্গিকতা বিশ্লেষণকে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করে।

পরিবেশগত দৃষ্টিভঙ্গি :

একাধিক গবেষক উন্নয়নমূলক প্রশাসনকে বুঝতে চেয়েছেন একটি পরিবেশগত দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে। পরিবেশগত এই দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রয়োগ করা হয়েছে দেশের আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক পরিকাঠামোর সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করার জন্য। যুক্তির বিষয় হল এই যে, উন্নতি হল একটি সার্বিক প্রক্রিয়া। একটি ক্রমবর্ধমান উপলব্ধি হল এই যে, জাতীয় উন্নতি এবং প্রশাসনের জন্য রাজনৈতিক উন্নতি আবশ্যিক। জাতীয় উন্নতিতে ভূমিকা নিতে জনপ্রশাসনের ক্ষমতাটিও এই রাজনৈতিক প্রশাসনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এটা জানা কথা যে প্রশাসন চূড়ান্ত ভূমিকা নেয় নীতি গঠনে এবং এটি কার্যকর করার ব্যবস্থাপনার ওপর। রাজনৈতিক পরিবেশ প্রশাসনিক পরিবেশের ওপর একটি শর্তমূলক প্রভাব স্থাপন করে।

সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং উন্নয়ন প্রশাসন

জনপ্রশাসনের বেশিরভাগ তাত্ত্বিকগণ সংগঠনের একটি ধারাকে স্বীকৃতি দেয় যেটি সর্বজন স্বীকৃত নয়। কিন্তু ওইসব দেশে এটি ছড়িয়ে পড়ে যেসব দেশগুলিকে তুলনামূলকভাবে উন্নয়নশীল বলা হয়। তারা এটা ভাবে না যে তাঁদের এই ধারণাগুলির প্রাসঙ্গিকতা নির্ভর করে প্রথাগত সংগঠনগুলির প্রাক্ অস্তিত্বের ওপর। সংগঠন এবং উন্নয়নের মধ্যে যে সম্পর্ক তা সহ-সম্পর্কযুক্ত নয়। একমাত্র অধিক উন্নত দেশগুলি সংগঠনকে তৈরি করে এই অর্থে

যে, এই শব্দটি সমাজবিজ্ঞানের সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়। কার্যকরী প্রথাগত সংগঠনগুলি উন্নত রাষ্ট্রগুলিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

অনুন্নত দেশগুলি এই ধরনের সংগঠনগুলিকে তৈরি করতে পারে না যেগুলি উন্নত প্রকল্পগুলিকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বা গতিশীল করার জন্য বিশেষ কার্যকরী। এর দ্বারা এটাই বোঝা যায় যে, সমাজ ব্যবস্থা যত অনুন্নত তাঁদের ক্ষেত্রে ওই সংগঠনগুলি তৈরি করা ভীষণ জটিল। আর যে সমাজতন্ত্রে এই ধরণের সংগঠনগুলি যত কম আছে তাঁদের ক্ষেত্রে উন্নতির পথ তত বাধাপ্রাপ্ত হয়।

পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে বেসরকারি সংগঠনগুলি প্রথম উত্থাপিত হয়েছিল একটি ব্যাপক প্রসারিত বিষয় হিসাবে। এই সংগঠনগুলি বিভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। যেমন—মঠ, সংঘ, ব্যবসায়িক কারখানা, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি হিসাবে। এই পরিকল্পনার মধ্যে দিয়ে জ্ঞান সংগ্রহ ও রূপান্তরিত করা হয়েছিল। ধীরে ধীরে এই প্রারম্ভিক পরিকল্পনার মধ্যে দিয়ে আধুনিক যুগে একাধিক জটিল সংগঠন গঠিত হয় যেমন—কর্পোরেশন, পাবলিক বডি ইত্যাদি।

অন্যথায় অপশ্চিমি দেশগুলিতে এক নতুন চিত্র দেখা যায়। এখানে কেবলমাত্র আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে বেতন ব্যবস্থাকে সংগঠিত করা হয়। একজন এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকায় অতিমাত্রায় ও অভূতপূর্ব উন্নতি দেখে অবাক হয়ে যায়। তবে এই ধরণের বিকাশ পাশ্চাত্য রূপরেখার ওপর ভিত্তি করেই তৈরি হয়। তবে অতিমাত্রায় পর্যবেক্ষণ বিভিন্ন সাংগঠনিক কাঠামোর অকৃতকার্য চরিত্রকে প্রকাশিত করে যদিও সেগুলি সংগঠনের মতোই দেখতে কিন্তু সেগুলি সংগঠনের মত কাজ করে না। তথাপি সবচেয়ে লক্ষণীয় পার্থক্য হল এই যে, প্রতিনিধিদের স্বার্থের ঘোষণা করার পরিবর্তে সরকারি কর্মচারীদের সম্পর্কের কথা বলা হয়। যে সকল গোষ্ঠী প্রায়শই তাঁদের নেতৃত্বের দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং যারা রাষ্ট্রের আমলাতন্ত্রের অধীনে কর্মরত। কিংবা কোনো শক্তিশালী রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত। এইভাবেই বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যে তাঁদের নেতৃত্বের স্বার্থকে সিদ্ধ করার প্রবণতা অধিক প্রতীয়মান হয়। এক্ষেত্রে তারা তাঁদের সদস্যদের যারা প্রথম সারিতে থাকে তাঁদের স্বার্থ বড় একটা দেখে না। এই সংগঠনগুলি বিভিন্ন ভাবে নিজেদের অগ্রগতি বা প্রগতির পথ তৈরি করতে পারে এবং সেক্ষেত্রে তাঁদের রাজনৈতিক জ্ঞান, বিচক্ষণতা এবং সদস্যদের সাংগঠনিক উদ্যম সামাজিক পরিবেশের ওপর তাঁদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করতেও সহায়ক হয়। এইভাবে এই সংগঠনগুলিকে প্রগতর ফল এবং কারণ রূপে গণ্য করা যেতে পারে। সামন্ততান্ত্রিক যে সকল নীতি প্রণয়ন করা হয় সেগুলি মূলত সমাজের প্রয়োজনে তৈরি হয়—সেই পরিকাঠামোর মধ্যে এই সংগঠনগুলি অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনতে সক্ষম। বিশেষত যে সমাজে বিভিন্ন ধরনের সংগঠনের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়।

রিগসের মতে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক এবং সাংগঠনিক বিষয়গুলির মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সংযোগ রয়েছে। অন্যভাবে বলা যায় যে রাজনীতির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য বেতন ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করা প্রয়োজন এবং বিভিন্ন সংগঠনের অস্তিত্ব থাকা আবশ্যিক। অনরূপভাবে অনস্বীকার্য সুসম রাজনৈতিক পরিকাঠামো, উপযুক্ত বেতন ব্যবস্থায় পরিবর্তিত না হলে সংগঠনগুলি সঠিকভাবে তৈরি হতে পারে না। আবার সুষম বেতন ব্যবস্থার প্রচলন করতে গেলেও প্রয়োজন সুষম রাজনীতি এবং সংগঠন।

একথা যথোপযুক্তভাবে বলা যায় যে, কোনো সামাজিক ব্যবস্থায় প্রগতির পর্যায়গুলিকে বিচারের ক্ষেত্রে

ভারসাম্য যুক্ত রাজনীতি পরিণত সাংগঠনিক ব্যবস্থা এবং আমলাতন্ত্রে সঠিক বেতন ব্যবস্থার প্রয়োগ বা প্রচলন অত্যন্ত জরুরী। একমাত্র এর মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠা করা যায় আধুনিক শাসনতান্ত্রিক উন্নয়নমূলক কর্মসূচিকেন্দ্রিক সমস্যার সমাধান। শাসনতান্ত্রিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যেগুলির প্রয়োজন হয় তার মধ্যে পরিবেশগত কারণও একটি বিরাট ভূমিকা পালন করে। পরিবেশের ভারসাম্যের অভাব ঘটলে তা সামাজিক ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে এবং এর ফলে শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতি এবং উন্নয়নের ক্ষেত্রে নানা অন্তরায়ের সৃষ্টি হয়। উদাহরণস্বরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং মানুষকেন্দ্রিক পরিবেশের উল্লেখ করা যেতে পারে।

প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে যে বিভিন্ন সমস্যাগুলি লক্ষ্য করা যায় তার পেছনে ভৌগোলিক, জলবায়ু এবং অবস্থানগত ভারসাম্যের অভাব নীহিত থাকে—এই প্রাকৃতিক শর্তগুলি কিন্তু উন্নয়নকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করে। সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলা যায় যে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের জলবায়ু নিরক্ষীয় অঞ্চলের জলবায়ু অপেক্ষা প্রগতির পথে অনুকূল। উন্নত শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা যে সকল রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেখানে সরকার অনায়াসেই বিবিধ সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম। অপর দিকে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় এর বিপরীত মুখী অবস্থাই লক্ষ্য করা যায়। অনুন্নত দেশগুলিতে উপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাবে প্রাকৃতিক বিপর্যয় জনিত ঘটনা বা পরিবেশগত ভারসাম্যের অভাব সমাজ ব্যবস্থাকে অধিক প্রভাবিত করে থাকে এবং যাকে অতিক্রম করা প্রশাসনের ক্ষেত্রে জটিল হয়ে ওঠে, কিন্তু এই ঘটনা উন্নত দেশগুলিতে লক্ষ্য করা যায় যাতে তারা তাদের পরিকাঠামোর সাহায্যে এই বিঘ্নগুলিকে সহজেই অতিক্রম করে অর্থনৈতিক অগ্রগতি অব্যাহত রাখে। এইভাবেই উন্নত দেশগুলিতে প্রশাসনিক দক্ষতা এবং উপযুক্ত পরিকাঠামোর কারণে প্রাকৃতিক পরিবেশ মানুষের উন্নতির পথে অন্তরায় না হয়ে আর সহযোগী মিত্রতে পরিণত হয়।

মানুষের চারপাশের পরিবেশের ক্ষেত্রেও এরকমই নানা সমস্যা পরিলক্ষিত হয়। মানুষ যেহেতু সামাজিক জীব সেই কারণে তাদের মধ্যে পারস্পরিক আদান প্রদান চলতেই থাকে। যদিও একটি মানুষের সঙ্গে আর একটি মানুষের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য গত তারতম্য অবশ্যই বিদ্যমান দেখা যায়। এই পার্থক্যের কারণেই একটি মানুষ তার বুদ্ধিমত্তার জোরে যে কাজটি অনায়াসেই করতে পারে, অপর ব্যক্তি হয়ত সেই কাজটির ক্ষেত্রে অসফল হলেও অন্য কোনো কাজে তার বিশেষ উৎকর্ষতা লক্ষ্য করা যায়। এই ভাবেই মানুষের ব্যক্তিগত তারতম্য এবং বুদ্ধিমত্তার পার্থক্যের ফলে সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেও বিভিন্ন প্রকারের তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। এই ভাবেই কাজের পার্থক্যের কারণে সমাজে তৈরি হয় শ্রেণিভেদ।

আপাত দৃষ্টিতে মানষের এই জাতীয় পরিবেশকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—(১) জনসংখ্যাগত (২) মানবিক ভেদাভেদগত (৩) দেহগত বৈশিষ্ট্য এবং (৪) কর্মক্ষেত্রের পার্থক্য।

মানুষের Demographic যে বৈশিষ্ট্য রয়েছে তাকে যদি বিশ্লেষণ করা যায়, তবে দেখা যাবে একটি সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে বহু সংখ্যক মানুষ একই স্থানে এবং কখনও কখনও বিবিন্ন অঞ্চলে বসবাস করে থাকে, যাদের সংখ্যা আনুপাতিক হারে কখনও বৃদ্ধি পায় কখনও হ্রাস পায়। একথা অনস্বীকার্য রাজনীতিতে কত সংখ্যক বিচক্ষণ মানুষ যুক্ত হয়েছেন তার দ্বারা সে রাজনৈতিক পরিকাঠামোর গুণমান নির্ণয় করা যায়। তবে কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্বার্থকতার পিছনে সংখ্যাগত বিষয়টিরও একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে। দেখতে হবে তার সদস্য সংখ্যা যেন কখনই স্বাভাবিকের তুলনায় অধিক বা ক্ষুদ্র না হয়। বস্তুত কোন একটি রাষ্ট্রের জনসংখ্যার পরিমাণ এবং জন ঘনত্বের তারতম্যের উপর সেই রাষ্ট্রের উন্নতি এবং অগ্রগতি বিশেষভাবে নির্ভরশীল।

অধুনা প্রগতির ক্ষেত্রে শারীরবৃত্তীয় উপাদানেরও একটা বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে Everett Hagen বলেছেন যে, প্রাচীন বা মধ্যযুগীয় সমাজ ব্যবস্থায় অধিকাংশ মানুষ যেহেতু রক্ষণশীল ছিলেন, সেই কারণে বেশকিছু রক্ষণশীল মানুষ যারা সমাজ পরিচালনায় মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করতেন, তারা সমাজ ব্যবস্থার ভারসাম্য রক্ষা করার অজুহাতে যে কোনো পরিবর্তনের পরিপন্থী ছিলেন। কিন্তু যে সকল রাষ্ট্র উন্নতির চরম শিখরে উপনীত হয়েছে, সেখানে সমাজের মাধ্যমেই এই সকল বিশিষ্ট ব্যক্তিরা প্রগতি আনার ক্ষেত্রে সর্বদা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। উপরন্তু সমসাময়িক অপশ্চিমীয় সমাজ ব্যবস্থায় দেখা যায় যে, তৃণমূল স্তর থেকেও বেশ কিছু ব্যক্তিত্বের অভ্যুদয় ঘটেছে যারা এই সমাজের পরিবর্তন ধারক এবং বাহকরূপে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছেন।

রিগসের মতে কর্তৃত্ববাদ একটি জটিল সম্পর্ককে অন্তর্ভুক্ত করে যেটি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়া জীবনের অন্যান্য রাস্তাগুলির সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করে। এই চ্যালঞ্জগুলি জীবনের চিন্তাভাবনা ও কাজকর্মের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বিপরীত দিকে গতানগতিক সমাজ ব্যবস্থায় আমরা কিছু মানুষকে দেখি যারা একটি মাত্র জীবন পদ্ধতির সঙ্গে জড়িয়ে রাখে কারণ তাদেরকে কোন বিকল্প রাস্তা দেখানো হয়নি এবং তারা নিজেরাও কোন ভিন্ন রাস্তা অনুসরণ করতে চায় না। এইভাবে সেই সমাজ ব্যবস্থায় অভিনবত্ব দেখা যায় না কারণ সেখানে সহজ লভ্য বিকল্পের আস্থার অভাব, পক্ষান্তরে কর্তৃত্ববাদকে দেখা যেতে পারে উন্নতি সাধনের একটি রাস্তা হিসাবে। ব্যক্তিগত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য শিক্ষামূলক ও পারিবারিক পরিচালন পদ্ধতির মধ্য দিয়ে পরিবর্তন করার প্রচেষ্টাগুলি উন্নত প্রশাসন ব্যবস্থার জন্য একটি প্রাসঙ্গিক বিষয় হতে পারে।

জনগণের ভিত্তিমূলক গুণাবলীর দিকে তাকিয়ে এটা বলা যায় যে উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হয় ব্যক্তিবর্গের উপযুক্ত অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, জ্ঞান ও ক্ষমতার অভাবে, যেগুলি একটি শিল্প চালিত সমাজ ব্যবস্থার জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজন। এটা বিবেচনা করা হয় যে বিদ্যালয় এবং অন্যান্য উপযুক্ত শিক্ষামূলক সুযোগ সুবিধাগুলিকে ব্যবহার করা যেতে পারে ঐ সকল ব্যক্তিবর্গের উপযুক্ত দক্ষতা ও জ্ঞান অর্জনের প্রশিক্ষণ হিসাবে।

উন্নত সামাজিক সংগঠনগুলি সদ্যদের প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও জ্ঞানের অন্তর্ভুক্তিকরণের মাধ্যমে তাদের সামাজীকিকরণ করতে পারে কিন্তু সমস্যা হল এই যে অনুন্নত আধা সংগঠনগুলির ক্ষেত্রে কেবলমাত্র ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের যে কার্যকরী করে তোলা কেবলমাত্র জটিল হবে না বরং তারা প্রকৃতপক্ষে ঐ সমস্ত মানুষদের যে উন্নত দক্ষতা দিয়ে পুনঃ সামাজিকীকরণ করে তোলে। উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়নের জন্য অতি প্রয়োজনীয় প্রাথমিক বিষয়গুলি হল সঠিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নেওয়া। সেই জন্য সরকারি চাকুরিজীবীদের আধুনিক ও উজ্জীবিত করার জন্য বিভিন্ন প্রকার ভাতা ও সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়। সাংস্কৃতিক পরিবেশের মধ্যে যে সমস্ত রীতি, প্রথা থাকে সেগুলি অগ্রগতির পিছনে বাধার সৃষ্টি হয়। সংস্কৃতি নামক শব্দটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। বহুকাল ধরে চলে আসা মানুষের দ্বারা সৃষ্ট মূলধন, রীতি, প্রথা ইত্যাদিকে বোঝায়। এই ব্যবস্থাটি অবশ্যই পরিবর্তিত হতে পারে রূপান্তর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, কিন্তু এই বৈশিষ্ট্যগুলির আপেক্ষিক গতিশীলতা হল সংস্কৃতির একটি স্মারক।

যে কোন রাজনৈতিক শাসন ব্যবস্থায় ভাষা হল একটি বিশেষ পরিচিত উপাদান, যা সাংস্কৃতিক পরিবেশের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে। কেউ কেউ আছেন যারা মনে করেন যে বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে ভাষা অনেক ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে। তাই যারা ঐ সব কথাবার্তা বলে তারা নিজেদেরকে আধুনিকীকরণ করতে প্রস্তুত

নয়। একটি উন্নতশীল শাসন ব্যবস্থার দ্বারা যে কোন ভাষাকে ব্যবহারে উপযোগী করে তুলতে পারে। অবশ্যই উন্নতির প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই পরিবর্তন ঘটাতে হবে।

ধর্ম সম্পর্কে একই ধরনের বক্তব্য বলা যায়। কিছু চিন্তাবিদের মতে প্রটেস্ট্যানিয়জম কেবল একমাত্র সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী শক্তি নয় যা পুঁজীবাদের বিকাশে সাহায্য করে কিন্তু অখ্রীষ্টান রাষ্ট্রগুলি ক্ষেত্রে আসা করা যায় বড়ো জোর এরা সুসভ্য হতে পারে। সভ্য রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারে। বর্তমানে এই দৃষ্টিভঙ্গির আর কোন জনপ্রিয়তা নেই যা জাতিগত বা সাম্প্রদায়িক বক্তব্যে পরিণত হয়েছে।

সুতরাং একমাত্র পথ যার দ্বারা নিরাপদে উন্নয়নমূলক পরিবর্তন করা যায় যা সম্পূর্ণ আলাদাভাবে উন্নয়নের সঙ্গে পরিচিতি ঘটায়। প্রত্যেক সংস্কৃতির সামগ্রীকভাবে অধ্যায়ন করার আবশ্যক। তারাই এই কাজটি করবে যারা ভাষা, ইতিহাস এবং ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞানী বা পারদর্শী।

৭০ এবং ৮০ দশকে উন্নয়নের সমস্যাগুলির পুনঃভাবনা করা হয়েছে বিভিন্ন পদ্ধতিতে। বুদ্ধির মাত্রাই হল উন্নয়নের মাপকাঠি। মানবিক প্রয়োজন, আর্থ সামাজিক লাভের সমানুপাতিক বণ্টন এবং উন্নতির দিকে তাকিয়ে মানুষের ক্ষমতায়ন করা হল। উন্নয়নের গবেষকরা আর সেইভাবে দেখে না যে তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলি সমরূপ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই সংস্কৃতির উপর গুরুত্ব দেয়।

উন্নয়নের কোনো একটি তত্ত্ব নেই। উন্নয়নের সমসাময়িক তত্ত্বগুলি হল—

১। বহুত্ববাদ, উন্নয়নের একাধিক পথের কথা বলে।

২। তাদের সাংস্কৃতিক অনুমানের ক্ষেত্রে পশ্চিমী অনুকরণ কিছুটা কমেছে।

সমসাময়িক উন্নয়নমূলক দৃষ্টিভঙ্গীর মূল উপাদানগুলির প্রতিফলন ঘটেছে Rogers, korten, klaus, Biur Bryant এবং White-এর চিন্তায় যার মধ্যে রয়েছে—

১। উন্নয়নের সুফল বণ্টনের ব্যাপক সাম্য।

২। জনপ্রিয় জনঅংশগ্রহণ, জ্ঞানের বণ্টন এবং ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সম্প্রদায়ের নিজস্ব উন্নয়ন প্রচেষ্টার মাধ্যমে ক্ষমতায়ন।

৩। নিজস্ব বিশ্বাস এবং উন্নয়নের স্বাধীনতা, স্থানীয় সম্পদের ব্যবহারের বিশ্লেষণ।

৪। উন্নয়নের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট্য কৌশলগুলিকে একত্রিত করা।

৩.৭ নমুনা প্রশ্নাবলী

(ক) দীর্ঘ প্রশ্নাবলী :

(১) উন্নয়ন প্রশাসনের অর্থ কী? উন্নয়ন প্রশাসনের উৎস ও উদ্দেশ্যগুলি ব্যাখ্যা করুন।

(২) গণপ্রশাসনে উন্নয়ন প্রশাসনের ভূমিকা আলোচনা করুন।

(খ) মাঝারি প্রশ্নাবলী :

(১) উন্নয়ন প্রশাসন ও সাবেকী প্রশাসনের পার্থক্য ব্যাখ্যা করুন।

(২) তৃতীয় বিশ্বের প্রেক্ষিতে উন্নয়ন প্রশাসনের ভূমিকা সম্বন্ধে লিখুন।

(গ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী :

(১) উন্নয়ন প্রশাসনের অর্থ কী।

(২) উন্নয়ন প্রশাসনের চারটি উপাদান উল্লেখ করুন।

(৩) টীকা লিখুন :

(ক) উন্নয়ন প্রশাসনের পরিবেশগত দৃষ্টিভঙ্গি,

(খ) উন্নয়ন প্রশাসনের রাজনৈতিক প্রেক্ষিত।

৩.৮ নির্বাচিত পাঠ

ঘোষ, সোমা, *জনপ্রশাসন-তত্ত্ব ও প্রয়োগ*, কলকাতা, প্রগ্রেসিভ প্রকাশনা, ২০১০।

বসু রাজশ্রী, *জনপ্রশাসন*, কলকাতা, রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০০৫।

সোম, সুভাষ, *জনপ্রশাসন*।

বসু, রুমকী ও চট্টোপাধ্যায়, পঞ্চানন, *জনপ্রশাসন*।

চক্রবর্তী, দেবাশীষ, *গণপরিচালন*।

একক-৪ (ক) ❑ জনপছন্দ তত্ত্ব ও নীতি বিশ্লেষণ

গঠন

৪.১ উদ্দেশ্য

৪.২ জনপছন্দ তত্ত্বের ভূমিকা

৪.৩ জনপছন্দ সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ

৪.৪ জনপছন্দ তত্ত্ব একটি ধারণাগত কাঠামো

৪.৫ উপসংহার

৪.৬ সারাংশ

৪.৭ পাঠ সমাপ্তি প্রশ্নাবলী

৪.৮ নির্বাচিত পাঠ

৪.৯ গ্রন্থপঞ্জী

৪.১ উদ্দেশ্য

এই পাঠ্য বিষয়টির উদ্দেশ্য হল জনপছন্দ তত্ত্বের ভূমিকা উপস্থাপনা করা এবং উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে প্রচলিত জননীতি প্রক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা করা। এই আলোচনা মূলত প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রীক ও সংগঠনকেন্দ্রীক।

পাঠশেষে শিক্ষার্থীগণ—

- জনপছন্দ তত্ত্বের ধারণাটি কী ও তা কিভাবে বিকশিত হয়েছে, সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জ্ঞান লাভ করবেন।
- জনপছন্দ তত্ত্বের মূল্যায়ন ও প্রয়োগ বৃত্তান্ত জানতে পারবেন।
- নীতি প্রক্রিয়া ও নীতি বিশ্লেষণ সংক্রান্ত ধারণা ও বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিগুলো সম্বন্ধে বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নে সক্ষম হবেন।

৪.২ জনপছন্দ তত্ত্বের ভূমিকা

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সাবেক আলোচনাক্ষেত্র ছিল সাংবিধানিক গণতন্ত্রের সমস্যাবলি—জনপছন্দ তত্ত্ব আধুনিক অর্থনৈতিক উপাদান ব্যবহার করে এই আলোচনা ক্ষেত্রের নবরূপায়ণ ঘটিয়েছে। জনপছন্দ তত্ত্ব সরকারকে তার পরিচালক, তথা আমলা ও রাজনৈতিক নেতাদের আঙ্গিকে অবলোকন করেছে। জনপছন্দ তাত্ত্বিকদের মতে, আমলা বা রাজনৈতিক ব্যক্তিরা নিজেদের অর্থনৈতিক লাভের স্বার্থে কাজ করে। জনপছন্দ তাত্ত্বিকদের আলোচ্য বিষয়াদি সংঘবদ্ধ করার জন্য সরকারের গঠন বৃত্তান্ত সম্যকভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন, যার প্রারম্ভিক পর্বে সরকারের উৎস সম্বন্ধে আলোচনা করা আবশ্যক। আইনসভার সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়া এবং এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের পথে

সাংবিধানিক প্রতিবন্ধকতাগুলোর আলোচনা জনপছন্দ তাত্ত্বিকদের আলোচনার অন্যতম ক্ষেত্র। 'Rent seeking' যা বাজার অর্থনীতির সঙ্গে সরকারি কাজের সম্পর্ক নির্ণয় করে, তা জনপছন্দ তত্ত্বের অন্যতম বিবেচ্য বিষয়। এই কারণে জনপছন্দ তত্ত্বকে অনেকেই নয়া রাজনৈতিক অর্থনীতি বলে চিহ্নিত করে থাকেন। জনপছন্দ তাত্ত্বিকরা উল্লেখ করেছেন যে বাজার অর্থনীতিতে সরকারের প্রধান কাজ হল, বিভিন্ন ধরনের বাজার সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধাগুলোর ব্যবস্থা করা। Rent-seekers বা ভাড়া-সন্ধানীরা ভোক্তাদের কাছে কাঙ্খিত দ্রব্যাদি ব্যবহার করে উৎপাদন ব্যবস্থাকে কিভাবে সঞ্চালনা করে, তা জনপছন্দের তাত্ত্বিকদের গবেষণার বিষয়। জনপছন্দ তত্ত্ব অবশ্য গণতন্ত্রের সাপেক্ষে উপস্থাপিত, পক্ষান্তরে স্বৈরতন্ত্রেও 'rent-seeking' এর প্রয়োগ থাকতে পারে, অর্থাৎ শোযোক্ত ধারণাটি কেবলমাত্র যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ্যভাবে যুক্ত নয়। কিন্তু ভাড়া-সন্ধানের সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম প্রয়োগপ্রক্রিয়া যেভাবে আইন প্রণয়নকারী, শাসনবিভাগের কর্ম কর্তা, আমলা, এমনকী, বিচারকদের ওপরেও চাপ সৃষ্টি করে, তার পরিপ্রেক্ষিতে জনপছন্দ তাত্ত্বিকরা যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ বিধি ও প্রতিষ্ঠানের কর্মপ্রক্রিয়া উপলব্ধি এবং মূল্যায়ন করার প্রচেষ্টা করে।

৪.৩ জনপছন্দ সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ

১৯৪৮ সালে ডানকাণ ব্ল্যাকের লেখনীর সূত্রে জনপছন্দের নতুন তাত্ত্বিক ধারার সূত্রপাত হয়। নির্বাচক তত্ত্বের ধারণা ব্ল্যাকের রচনার মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়। ১৯৫৮ সালে ডানকান ব্ল্যাক The Theory of Committees and Election রচনা করেন, যা জনপছন্দের তাত্ত্বিক ধারায় নতুন দিগন্ত আনে। গর্ডন তুলক (১৯৮৭, পৃঃ ১০৪০) ডানকাল ব্ল্যাককে জনপছন্দ তত্ত্বের জনক হিসেবে অভিহিত করেছেন। George Mason University-এর জেমস এম. বুচানন এবং গর্ডন তুলক যুগ্মভাবে ১৯৬২ সালে *The Calculus of Consent : Logical Foundations of Constitutional Democracy* রচনা করেন, যা জনপছন্দ তত্ত্বকে একটি শাস্ত্রীয় শাখায় উন্নীত করে। এছাড়া আরো যে সকল রচনা জনপছন্দ তত্ত্বকে সমৃদ্ধ করেছিল তা হল, কেনেথ অ্যারোর Social Choice and Individual Values (১৯৫১), অ্যান্থনি ডাউনের *An Economic Theory of Democracy* (১৯৫৭), ম্যানকার অলসনের *The Logic of Collective Action* (১৯৬৫)। ১৯৬৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে Public Choice Society গঠিত হয় এবং তার ফলে জনপছন্দ তত্ত্বের বিকাশ তরান্বিত হয়। ১৯৫০-এর দশকে এই তত্ত্বের উদ্ভব হলেও ১৯৬৮ সালে জেমস বুকানন নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পরে জনপছন্দ তত্ত্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

সরকারি নীতির অদক্ষতার ধারাবাহিক প্রবণতা নিয়ে আলোচনার প্রেক্ষিতে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অর্থনৈতিক বিশ্লেষণকে ব্যবহার করেন জনপছন্দ তাত্ত্বিকরা। অস্ট্রিয়ার জনপছন্দ তাত্ত্বিকগণ, যথা, মাইসেস, হায়েক, কারজনার এবং বোয়েট্কে মনে করেন যে আমলা ও রাজনীতিকরা উপকার বিতরণকারী, কিন্তু তাদের কাছে তথ্যের অপ্রতুলতা রয়েছে। দৃষ্টবাদী জনপছন্দ তত্ত্ব একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক পরিকাঠামোর সাপেক্ষে কী ধরনের সরকারি নীতি প্রযুক্ত হবে, তার ওপরে আলোকপাত করে থাকে; অন্যদিকে কোন্ নীতির প্রয়োগ কাঙ্খিত পরিণাম এনে দেবে, তা বিবেচনা করে নীতিমানজ্ঞাপক জনপছন্দ তত্ত্ব।

উল্লেখ্য যে আধুনিক জনপছন্দ তত্ত্বের পূর্বসূরী ছিলেন লার্ট উইকসেল (১৮৯৬)। যিনি কর ও ব্যয়ের মধ্যে সম্পর্ক নিরূপণ করে উপকারিতার নীতির সাপেক্ষে সরকারকে রাজনৈতিক বিনিময় মাধ্যম হিসেবে অবলোকন করেন।

আধুনিক জনপছন্দ তত্ত্ব 'জনপছন্দের জনক' ডানকান ব্ল্যাকের রচনার সূত্রে যাত্রা শুরু করে। ১৯৪৮ সাল থেকে লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত বিভিন্ন জায়গায় জনপছন্দ তত্ত্বের আলোচনা তার জায়গা করে নেয়; এই প্রবন্ধগুলো পরবর্তীকালে সংকলিত হয়ে প্রকাশিত হয়, *The Theory of Committees and Elections* (১৯৫৮)। সাধারণ আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি ব্যবহার করে ব্ল্যাক এই তত্ত্বের সাধারণীকরণ করে প্রকাশনা করেন 'Theory of Economic and Political Choices'।

জনপছন্দ তত্ত্বের বিকাশে অন্যান্য উল্লেখযোগ্য অবদানগুলো, তথা কেনেথ জে. অ্যারোর *Social Choice and Individual Values* (১৯৫১), অ্যান্থনি ডাউনসের *An Economic Theory of Democracy* (১৯৫৭), ম্যানকার অলসনের The Logic of Collective Action (১৯৬৫) প্রভৃতি উল্লেখের দাবি রাখে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, জেমস এম. বুকানন ও গর্ডন তুলকের যুগ্ম রচনা *The Calculus of Consent : Logical Foundations of Constitutional Democracy* (১৯৬২) জনপছন্দ তত্ত্বের বিকাশে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এই রচনার মাধ্যমে দৃষ্টবাদী অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে সাংবিধানিক গণতন্ত্রের বিকাশের ওপর আলোকপাত করেন উক্ত লেখকদ্বয়, যদিও তারা সম্মতির নৈতিক ভিত্তিকে অস্বীকার করেনি।

নোবেল পুরস্কার জয়ী জেমস বুকানন (১৯৮৬ সালে নোবেল জয়) এবং গর্ডন তুলককে আধুনিক জনপছন্দ তত্ত্বের প্রাথমিক তাত্ত্বিক বলে মনে করা যেতে পারে; তাঁদের রচনা, *Calculus of Consent* (১৯৬২) অদ্যাবধি এ বিষয়ে অনবদ্য রচনা হিসেবে দাবি করতে পারে। একটি বিশেষ উদ্ধৃতির সারমর্ম অনুযায়ী অর্থনীতিকে হাতিয়ার করে তুলক এবং বুকানন জেমস ম্যাডিসনের দেখা মার্কিন রাজনীতির কাঠামোকেই তুলে ধরেছিলেন। তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে গঠিত গণতন্ত্রের আলোচনা, তথা, সংসদীয় গণতন্ত্রের বেড়াজাল অতিক্রম করে সাংবিধানিক কাঠামোর ওপরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। অর্থনীতির দৃষ্টিতে সংবিধান বিশ্লেষণ তাঁদের অনবদ্য অবদান। নির্বাচন বিধি, যথা সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটদানের প্রশ্নকে সাংবিধানিক কাঠামোর নিরিখে বিশ্লেষণের চেষ্টা করে এই লেখক দ্বয় নির্বাচনী বিধি পছন্দের ওপরে জোর দেন এবং সমস্ত বিষয়টিকে আধুনিক অর্থনৈতিক নীতির ভিত্তিতে উপস্থাপিত করেন।

৪.৪ জনপছন্দ তত্ত্ব একটি ধারণাগত কাঠামো

জনপছন্দ অর্থনীতি থেকে উদ্ভুত একটি ধারণা, যা করব্যবস্থা এবং সরকারি ব্যয় সংক্রান্ত পাঠ থেকে আত্মপ্রকাশ করেছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা বর্তমানে জনপছন্দের দৃষ্টিভঙ্গিকে কেন্দ্রস্থলে নিয়ে এসেছে, কারণ রাজনীতি ও সরকার কিভাবে অর্থনীতির প্রক্রিয়া ও হাতিয়ার ব্যবহার করে চলেছে তা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গবেষণার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। অর্থনীতিবিদগণ যখন ব্যক্তিগত ক্ষেত্র হিসেবে বাজারে ব্যক্তির আচরণ ব্যাখ্যা করতে উদ্যত, জনপছন্দ তাত্ত্বিকরা তখন অর্থনীতির আলোচনার একক ব্যবহার করে বাজারে জনগণের আচরণবিধির পরিপ্রেক্ষিতে যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যবস্থাকে বিশ্লেষণ করতে সচেষ্ট হয়।

জনপছন্দ অর্থনীতির প্রক্রিয়া ব্যবহার করে রাজনীতি ও সরকারের তত্ত্ব ও প্রয়োগ সংক্রান্ত বিষয়াদি উপলব্ধি করতে সচেষ্ট, যা গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যবস্থা সম্বন্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি গড়ে তোলে। অর্থনীতির সাধারণ নীতিগুলো বা ধারণাগুলো যৌথ সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সম্যক উপলব্ধিতে কিভাবে সহায়তা করে তা জনপছন্দের

দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বোঝার চেষ্টা করা হয়; অর্থাৎ, সংবিধান, সংসদ, কমিটি, নির্বাচন ব্যবস্থা, রাজনৈতিক দল, স্বার্থগোষ্ঠী, আমলা এবং সরকারের অন্য অংশ ও ব্যবস্থাগুলো কিভাবে কাজ করে তা বোঝার জন্য জনপছন্দ তাত্ত্বিকরা অর্থনীতির নীতি ও হাতিয়ারগুলোকে ব্যবহার করে থাকেন। যেমন, নতুন রাস্তা তৈরীর জন্য সম্পত্তি কর বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত একাধারে অর্থনৈতিক ও অন্যধারে রাজনৈতিক। ব্যয় ও উপকারিতার নিরিখে উভয়ক্ষেত্রেই পছন্দ নির্ণিত হয়। উল্লেখ্য যে ব্যয় ও উপকারিতার এই খতিয়ান নিছক অর্থনৈতিক ব্যয় এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক উপকারিতা সরলীকৃত হিসাব নয়।

আমলাতন্ত্রের অদক্ষতা ও স্বার্থপরতা বাজারকেন্দ্রীক অর্থনীতির চাহিদার সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে ওঠায় সরকারি ব্যবস্থা সম্বন্ধে নতুন ব্যাখ্যা ক্রামগত প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। জনপছন্দ তত্ত্ব এই নতুন ব্যাখ্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম, যাকে সর্বাধিক জনপ্রিয়তা দেন ভিনসেন্ট অস্ট্রোম তাঁর *The Intellectual Crisis in American Administration* বইটির মাধ্যমে। জনপছন্দ তাত্ত্বিকরা মনে করেন যে, ব্যক্তিগত সুখ অর্জন যেকোনো যুক্তিবাদী ও অর্থনৈতিক মানুষের লক্ষ্য; ব্যক্তিগত সুখ বলতে তারা ব্যক্তিগত কার্যকরী সমৃদ্ধিকে বুঝিয়েছেন। জনপছন্দ তাত্ত্বিকদের মতে, জনকল্যাণমুখী কর্মসূচী কখনওই সফল হয় না, যতক্ষণ না ব্যক্তিগত সমৃদ্ধি ঘটে। জনপছন্দ তত্ত্বের প্রবক্তাদের মতে আমলাতন্ত্রও যেহেতু কয়েকজন ব্যক্তির সমন্বয়ে গড়ে ওঠে, যারা দক্ষতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে নিজেদের পদ সুনিশ্চিত করেন। সেহেতু আমলারূপে ব্যক্তিরাও নিজেদের ব্যক্তিগত সমৃদ্ধির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, অর্থাৎ, জনকল্যাণকামী কাজে তারা তখনই মনোযোগ দেয়, যখন তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধ হয় বা যখন ঐ কর্মসূচী তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থের সঙ্গে সংঘাতপূর্ণ না হয়। অস্ট্রোম ও নিস্কানেন অভিমত প্রকাশ করেন যে, ব্যক্তিগত স্বার্থ রক্ষার্থে আমলাতন্ত্র স্থিতিশীলতা বজায় রাখে।

জনপছন্দ তত্ত্বে আমলাতন্ত্রের সংকীর্ণায়নের ওপরে যেমন গুরুত্ব আরোপ করা হয়, তেমনি জনগণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে পরিষেবা প্রদানের কথা বলা হয়। জনপছন্দ তাত্ত্বিকরা রাষ্ট্রকে গণমুখী করে গড়ে তুলতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন, যা নিছক বাজার বনাম রাষ্ট্র বিতর্ক নয়; বরং রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি ও বেসরকারি বাজারকেন্দ্রীক অর্থনীতির মধ্যে সহাবস্থান ও প্রতিযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তোলাকেই জনপছন্দ তাত্ত্বিকদের আগ্রহ।

জনপছন্দ দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী যে অর্থনীতিবিদরা তাদের আলোচনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চান, তারা আইন প্রণেতাদের উদ্দেশ্য ও কাজকেও তাদের পর্যালোচনার মধ্যে রাখেন। যদিও আইনপ্রণেতারা জনগণের তথা করদাতাদের অর্থ, অর্থাৎ জনগণের সম্পদ ‘জনস্বার্থে’ই ব্যবহার করবেন বলে প্রত্যাশিত। রাজনীতিবিদগণ করদাতাদের অর্থ বাঁচাতে সচেষ্ট হতে পারেন; কিন্তু তারা যে সুদক্ষ সিদ্ধান্ত এই লক্ষ্যে গ্রহণ করে থাকেন, তা তাদের নিজের অর্থ সঞ্চয় করার কোনো পথ দেখায় না বা নাগরিকের সঞ্চিত অর্থের কোনো অংশ প্রদান করে না; শক্তিশালী স্বার্থগোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত হয়ে জনগণের উপকার করার এই চেষ্টা জনগণের ওপর কোনো প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলে না, অর্থাৎ জনগণ এই উপকার সম্বন্ধে বা উপকারকারী সম্বন্ধে কতটা অবগত হয়ে ওঠে তাও বিতর্কের বিষয়। অতঃপর জনস্বার্থে সুপরিচালনের জন্য উৎসাহব্যঞ্জক উদ্দেশ্য খুঁজে পাওয়া যথেষ্ট দুরূহ। পক্ষান্তরে, জনগণের দ্বারা গঠিত স্বার্থগোষ্ঠীগুলো সরকারের কাজের দ্বারা উপকৃত হলে রাজনীতিবিদগণ রাজনৈতিক কর্মসম্পাদনে আর্থিক আনুকূল্যও লোকবল লাভ করতে পারে এবং লক্ষ্যপূরণে অধিকতর সমর্থ হয়ে উঠতে পারে। যে লক্ষ্য জনস্বার্থ কিনা তা নিয়ে দ্বিমত থাকতে পারে।

জনপছন্দ তাত্ত্বিকগণ স্থানীয় সরকারের ওপর অনেক বেশি নির্ভর করে। তাদের মতে, স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে কর্ম নির্বাহ বাজেটের ওপর সুপ্রভাব ফেলে, অর্থাৎ ব্যয় হ্রাস করে। জনপছন্দ অর্থনীতিবিদরাও নীতি পরিবর্তন করে আইনের দায়ভার কমাতে আগ্রহী যা বিশেষ স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রণীত হয় এবং পরিণামে সরকারের ব্যয় বৃদ্ধি করে। ১৯৮০-এর দশকের শেষভাগে তদানীন্তন রেগন প্রশাসনের Office of Management and Budget এর প্রধান James C. Miller, যিনি একজন জনপছন্দ তাত্ত্বিকও ছিলেন, ‘German-Rudman Law’ প্রণয়নে সহায়তা করেন; এই আইনের উদ্দেশ্য ছিল বার্ষিক ব্যয়ে সীমা নির্ধারণ করা এবং যদি সেই সীমা লঙ্ঘিত হয়, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই উর্দ্ধসীমা যাতে আরো হ্রাস পায়, তার ব্যবস্থা করা। ব্যয় হ্রাসের ক্ষেত্রে এই আইন সাময়িকভাবে প্রভাব ফেলেছিল।

বর্তমানে কিভাবে সরকারি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তার সম্বন্ধে ধারণা তৈরি করতে গিয়ে জনপছন্দ তাত্ত্বিকগণ যৌথ সিদ্ধান্তগ্রহণ ব্যবস্থাকে যে রীতি-নীতিগুলো প্রভাবিত ও পরিচালিত করে, তা বিশ্লেষণ করার ওপর জোর দিয়েছেন। রাজনৈতিক কার্যাবলি যে সাংবিধানিক রীতি-নীতির দ্বারা পরিচালিত হয়, তার বিশ্লেষণের ওপর জনপছন্দ তাত্ত্বিকগণ গুরুত্ব আরোপ করেন; এই প্রচেষ্টা থেকেই সৃষ্ট হয় জেমস বুচানন ও গর্ডন তুলকের *The Calculus of Consent*।

ক্রমে micro-economic, তথা ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি জনপছন্দ তত্ত্বে বহু অবদানের সাক্ষর রাখে, যা দেখায় যে, কিভাবে ব্যক্তিস্বার্থের সমীকরণ বাজার এবং জননীতি, উভয়কেই প্রভাবিত করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ নিস্কানেনকে (১৯৭১) অনুসরণ করে বলা যায়, যে রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত আমলাগণও আত্মস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য বাজেট বাড়াতে পারে, আবার পক্ষান্তরে নাগরিকরাও সংগঠিত হয়ে জনগণের মঙ্গলের জন্য যৌথ কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারে। যেমন বুকানন (১৯৬৫) ভেবেছিলেন। অ্যারো (১৯৫১) সামাজিক কল্যাণকর কাজের সম্ভাবনা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করে বলেন যে, যুক্তিসংগত কারণেই দেখা যায় যে, যেকোনো গণতান্ত্রিক সমষ্টিকরণ প্রক্রিয়া অসংগতিপূর্ণ ও অস্থায়ী পরিণাম নিয়ে আসে। যৌথ সিদ্ধান্তগ্রহণ ব্যবস্থাটিই অপর্যাপ্ত এবং ত্রুটিপূর্ণ বলে মন্তব্য করা হয়; বাজার বা রাজনীতি কেউই নিজের থেকে পর্যাপ্ত পরিষেবা প্রদান করতে পারে না। বাজারের ত্রুটিযুক্ত অবস্থান ও কার্য সম্পাদনের জন্য একচেটিয়া ক্ষমতার আস্ফালন দেখা যায়, জনমঙ্গলের ওপর প্রভাব পড়ে, বাহ্যিক সমস্যা দেখা যায় এবং সর্বোপরি তথ্যগত সমস্যা সবথেকে বড় দুর্বলতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

সরকারের ব্যর্থতাও গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সীমাবদ্ধতা সৃষ্টি করে। আমলারা নিজেদের স্বার্থপূরণের তাগিদে একদিকে যেমন বাজেটে বৃদ্ধিতে উৎসাহ দেয়, অন্যদিকে তেমনি নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাগুলির ওপর নিজেদের দখল প্রতিষ্ঠা করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তগ্রহণ ব্যবস্থার ‘যুক্তি নির্ভরতা’ সেচ্ছাচারী ও অস্থায়ী হয়ে উঠতে পারে, যেভাবে অ্যারোও (১৯৫১) আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। অ্যারো সামাজিক কল্যাণকর কাজের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে বলেন যে যৌথ যুক্তিবোধের নিরিখে গৃহীত, বিকল্প সম্বন্ধে ভাবনারহিত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সামাজিক কল্যাণ সাধন হয় না। সমাজের পছন্দ যৌথ যৌক্তিকতার পরিচায়ক নয় এবং ব্যক্তিগত পছন্দেরও সমষ্টিকৃত সত্তা নয় বলে অ্যারো অভিমত প্রকাশ করেন। আনুষ্ঠানিক গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ার পরিপূরক প্রয়োজন বলে মনে করা হয়।

আধুনিক ব্যষ্টিগত অর্থনৈতিক তত্ত্ব স্পষ্টভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহীতাদের স্বাধীনতা ও পারস্পরিক নির্ভরতাকে স্বীকৃতি দেয়। এই তত্ত্ব রীতি-নীতির গুরুত্ব স্বীকার করে এবং স্থায়ী, সুদক্ষ এবং কখনও কখনও সুষম পরিণামের অনুকূল

পরিস্থিতির সপক্ষে তথ্য সম্বন্ধে আলোচনা করে থাকে। দৃষ্টান্ত সহযোগে এই আলোচনা আচরণবাদী বিজ্ঞানকে অনেক বাস্তবভিত্তিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। জনপছন্দ তত্ত্বের অনুগামীদের আলোচনায় এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব লক্ষণীয় হলেও জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রশাসনিক নীতি সংকীর্ণ ও রক্ষণশীল আইনের গন্ডীর সীমা অতিক্রম করে ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছা ও পছন্দকে গুরুত্ব দিতে তাদের অধিক আগ্রহ দেখা যায়। ব্যক্তির পছন্দকে জনপছন্দ তাত্ত্বিকরা ব্যক্তিগত কার্যকরী সমৃদ্ধির আলোকে ব্যাখ্যা করেছেন। Claus Offe উল্লেখ করেন যে, 'efficiency is no longer defined as "following the rules" but as "causing of effects."

জনপছন্দ তত্ত্বের মূল বক্তব্য হল সরকারের অতি ক্রীয়শীলতাকে নিয়ন্ত্রণ করা দরকার এবং সেই কারণে সাংবিধানিক সংস্কারও আবশ্যক। জনপছন্দ তত্ত্ব সরকারের ওপর থেকে স্বার্থগোষ্ঠীর প্রভাব হ্রাস করার সুপারিশ করেছে এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের সপক্ষে সওয়াল করেছে। নিসকানেন এ প্রসঙ্গে চারটি পদক্ষেপের ওপর জোর দিয়েছেন—

(১) শাসনবিভাগ ও আইন বিভাগের মাধ্যমে আমলাদের ওপর কঠোরতর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা;

(২) জনপরিষেবা প্রদানকে অনেক বেশি প্রতিযোগিতামূলক করে তোলা;

(৩) অপব্যয় হ্রাসের জন্য বেসরকারিকরণ অথবা চুক্তিনির্ভর পরিষেবা;

(৪) জনপরিষেবা ক্ষেত্রে সম্ভাব্য বিকল্প সম্বন্ধে জনস্বার্থে আরো বেশি তথ্য প্রদান, যাতে প্রতিযোগিতামূলক দামে জনপরিষেবা প্রদান করা যায়।

জনপরিষেবা প্রদানে বাজারকেই কেন্দ্রীয় অবস্থানে রেখেছেন জনপছন্দ তাত্ত্বিকগণ। নাগরিক বান্ধব অ-আমলাতান্ত্রিক সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তোলার ওপর জনপছন্দ তত্ত্ব জোর দেয়। জনপছন্দ তত্ত্বে রাষ্ট্র বনাম বাজার বিতর্ক গুরুত্ব পায়নি; বরং এই তত্ত্বের প্রধান বক্তব্য বিষয় হল। কিভাবে রাষ্ট্রকে আরো বেশি গণতান্ত্রিক করে তোলা যায় এবং বাজারকে সামনে রেখে রাষ্ট্রকে আরো নাগরিক বান্ধব করে তোলা যায়।

৪.৫ উপসংহার

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ওপর জনপছন্দ অর্থনীতির প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। নির্বাচন, আইনসভা, আমলাতন্ত্র প্রভৃতির কাজ, ভূমিকা ও প্রকৃতি নিয়ে একটি নতুন ভাবনার সূত্রপাত হয় জনপছন্দ তত্ত্বের হাত ধরে। রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অগ্রাধিকার পাওয়া উচিৎ না বাজারী প্রক্রিয়ার, তা জনপছন্দ তাত্তিকদের আলোচনায় উঠে এসেছে। স্বার্থগোষ্ঠীগুলোর জোটের দ্বারা সংখ্যালঘিষ্ঠের উন্নতির বিভিন্ন ধারা জনপছন্দ তত্ত্বের প্রবক্তাদের আলোচনায় উঠে এসেছে। কয়েকজন জনপছন্দ তাত্ত্বিক সরকার ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার ওপর সাংবিধানিক নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধির ওপরেও জোর দিয়েছেন।

জনপছন্দ তত্ত্বের আলোকে যে সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা হল অনন্য 'জনস্বার্থ' বলে কিছু হয় না। জন সমাজে বহু মুল্যবোধ ও চিন্তার সমাবেশ ঘটে থাকে; বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন মূল্যবোধ ও বিভিন্ন স্বার্থের দ্বারা দ্রবীভূত। পরস্পরের প্রতিযোগী এই স্বার্থগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা অবশ্যম্ভাবী। রাজনৈতিক প্রক্রিয়া কিভাবে এই বিচিত্র বহুমুখী স্বার্থ ও চাহিদাগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে সক্ষম হয় তাই বিবেচ্য বিষয়।

জনপছন্দ তাত্ত্বিকদেরও বিভিন্ন ধারা বর্তমান। কয়েকজন যেমন, রক্ষণশীল, কয়েকজন তেমনি উদারবাদী বা

কেইনসীয় অর্থনৈতিক তত্ত্বের দ্বারা উদ্বুদ্ধ; জনপছন্দ তাত্ত্বিকদের মধ্যে কেউ কেউ আবার কেইনসের অর্থনীতির ভাবনার বিরোধীতা করেন। আবার কেউ কেউ মনে করেন যে বাজারের ব্যর্থতা মোকাবিলায় সরকারের একটি কার্যকরী ভূমিকা থাকে। উল্লেখ্য যে জনপছন্দ তাত্ত্বিকগণ বাজারে সচলতাকে আলোচনার কেন্দ্রে রাখলেও সরকার ও বাজারের আপেক্ষিক সম্পর্ক নিয়ে বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন।

৪.৬ সারাংশ

অর্থনীতির বিশেষ ধারা হিসেবে জনপছন্দ তত্ত্ব অর্থনীতির রাজনৈতিক বিশ্লেষণ বা রাজনীতিতে অর্থনীতির অনুপ্রবেশের ওপর আলোকপাত করে। রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিভিন্ন বিষয় অনুধাবন করার জন্য অর্থনৈতিক হাতিয়ার ব্যবহার করে জনপছন্দ তাত্ত্বিকরা তাদের ধারণাকে সমৃদ্ধ করে। অর্থনীতি ও রাজনীতির সম্পর্কের টানাপোড়েনের নিরিখে জনপছন্দ তাত্ত্বিকগণ নির্বাচক, রাজনীতিবিদ, সরকারি আধিকারিক এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থায় তাদের মিথস্ক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করে। কনিষ্ঠ জেমস বুচানন ও গর্ডন তুলক এই আলোচনার সূত্রপাত করেন। বুচানন ১৯৮৬ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। সাবেক অর্থনীতির ধারণা অনুসরণ করে এই তত্ত্ব রাজনীতিবিদ ও আমাদের যুক্তিসিদ্ধ বাহক হিসেবে বিবেচনা করে। জনপছন্দ তাত্ত্বিকদের মতে, রাজনীতিবিদ এবং আমলারা নিজেদের স্বার্থের সর্বাধিক তৃপ্তির জন্য কাজ করে, এর ফলে অন্যান্যরা যেটুকু উপকৃত হয়, তা সমাজের জন্য উপরি পাওনা মাত্র, অর্থাৎ সমাজের সার্বিক স্বার্থরক্ষা কখনওই এদের প্রধান উদ্দেশ্য নয়। এই তত্ত্ব মনে করে যে, ব্যবসায়ীরা অধিক মুনাফার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে এবং রাজনীতিবিদগণ পরবর্তী নির্বাচনে জয়লাভের জন্য নীতি গ্রহণ করে থাকেন। এই কর্মকাণ্ডে সাধারণ মানুষের যেটুকু উপকার হয়, তা অতিরিক্ত।

সরকারি সিদ্ধান্ত কিভাবে গৃহীত হয়, তা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে জনপছন্দ তত্ত্বের প্রবক্তাগণ অর্থনৈতিক তত্ত্বের দ্বারস্থ হন; জনপছন্দ তত্ত্বের আলোকে বাজার সংক্রান্ত যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া সম্বন্ধে সম্যক উপলব্ধি সম্ভব হয়েছে এবং অন্তরালে থাকা বহু সমস্যা যেমন নির্দিষ্ট গোষ্ঠীগুলির স্বার্থ এবং সংখ্যালঘিষ্টের শোষণের প্রশ্ন স্পষ্টরূপে আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছে। জনপছন্দ তত্ত্বের ধারক ও বাহকগণ নির্বাচক, লবিগোষ্ঠী, রাজনীতিবিদ, আধিকারিক প্রমুখদের সংকীর্ণ স্বার্থবোধকে প্রকাশ্যে আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে এসেছেন এবং উল্লেখ করেছেন যে এরা নুন্যতম প্রয়াসে নিজেদের স্বার্থের সর্বাধিক পূরণের জন্য ব্যপৃত থাকে এবং এই প্রয়াসের মধ্যে নিহিত থাকে সরকারের ব্যর্থতার প্রধান কারণ। জনপছন্দ তত্ত্বের বিশ্লেষণ অনুযায়ী রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগ্রহণ জনগণের স্বার্থপূরণের হাতিয়ার নয়, বরং ব্যক্তিস্বার্থ ও গোষ্ঠী স্বার্থ চরিতার্থ করার মাধ্যম।

৪.৭ পাঠ সমাপ্তি প্রশ্নাবলী

(ক) দীর্ঘ প্রশ্নাবলী :

(১) জনপছন্দ তত্ত্বের উদ্ভব ও বিকাশের ওপর একটি টীকা রচনা করুন।

(২) জনপছন্দ তত্ত্বের উদ্ভবের প্রেক্ষিতটি পর্যালোচনা করুন।

(৩) জনপছন্দ তত্ত্বটি সমালোচনাসহ ব্যাখ্যা করুন।

(৪) 'Public Choice applies the methods of economics to the theory and practice of politics and government...' যুক্তিসহযোগে মন্তব্য করুন।

(খ) মাঝারি প্রশ্নাবলী :

(১) জনপছন্দ তত্ত্বটির সমালোচনা লিখুন।

(২) জনপছন্দ তাত্ত্বিকরা মনে করেন যে অর্থনীতিতে 'বাজারের ব্যর্থতা'র মত সরকারও ব্যর্থ হতে পারে। এ প্রসঙ্গে জনপছন্দ তাত্ত্বিকরা কিভাবে বাজারের ব্যর্থতার বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন?

(গ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী :

(১) জনপছন্দ তত্ত্বের পাঁচ জন তাত্ত্বিকের নাম লিখুন।

(২) নিসকান সরকারের অতি ক্রিয়াশীলতা নিয়ন্ত্রণের জন্য কয়টি পদক্ষেপের কথা বলেন? সেগুলি চিহ্নিত করুন ?

৪.৮ নির্বাচিত পাঠ

ঘোষ, সোমা, *জনপ্রশাসন-তত্ত্ব ও প্রয়োগ,* কলকাতা, প্রগ্রেসিভ প্রকাশনা, ২০১০।

বসু রাজশ্রী, *জনপ্রশাসন*, কলকাতা, রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০০৫।

সোম, সুভাষ, *জনপ্রশাসন*।

বসু, রুমকী ও চট্টোপাধ্যায়, পঞ্চানন, *জনপ্রশাসন*।

চক্রবর্তী, দেবাশীষ, *গণপরিচালন*।

৪.৯ গ্রন্থপঞ্জী

Arora, R., *Public Administration—Fresh Perspectives*, New Delhi, Aalekh Publ., 2004.

Basu, Rajasree, *Jana Prasashan*—(Bengali)- Paschim Banga Rajya Pustak Parshad, 2005

Chakraborty, Bidyut, *Reinventing Public Administration-The Indian Experience*, Orient Longman, 2007

Ghosh, Soma, *Jana Prasashan: Tatto '0' Pryog*, Kolkata, Progressive, 2012.

Henry, Nicholas, *Public Administration And Public Affairs*,–PHI Learning Pvt Ltd, 2010.

Sapru, R.K., *Administrative Theories and Management Thought*, New Delhi, Prentice Hall, 2008.

একক-৪ (খ) ❑ জনপছন্দ তত্ত্ব ও নীতি বিশ্লেষণ

গঠন

৪.১১ নীতি বিশ্লেষণ ভূমিকা

৪.১২ নীতি বিশ্লেষণ পাঠের বিকাশ

৪.১৩ নীতি বিশ্লেষণ—একটি ধারণাভিত্তিক টীকা

  ৪.১৩.১ নীতি বিশ্লেষণ অনুধাবনের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি

  ৪.১৩.২ নীতি বিশ্লেষণের বিভিন্ন মডেল

৪.১৪ উপসংহার

৪.১৫ সারাংশ

৪.১৬ পাঠ সমাপ্তি প্রশ্নাবলি

৪.১৭ গ্রন্থপঞ্জী

৪.১৮ নির্বাচিত পাঠ

৪.১১ নীতি বিশ্লেষণ ভূমিকা

জননীতি

যে কোনো ধরনের কর্মপ্রকল্প, যা যেকোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী, ব্যবসাক্ষেত্র, সরকার প্রভৃতিকে আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ করবার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের সহায়তা করে, তা নীতি বলে পরিচিত। জননীতি হল সরকার-এর দ্বারা অর্থাৎ সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দ্বারা গৃহীত আনুষ্ঠানিক ও ব্যক্ত সিদ্ধান্ত ও কর্মপ্রক্রিয়া। বর্তমানে জননীতি সংক্রান্ত গবেষণায় জননীতির বৌদ্ধিক প্রকার বিশ্লেষণের প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যার ভিত্তিতে রাজনৈতিক সমস্যার সম্ভাব্য সমাধানগুলি খোঁজার প্রচেষ্টা চলছে।

উক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে, জননীতি প্রক্রিয়া হল এমন একটি ব্যবস্থা যার মাধ্যমে সরকারের নীতি গৃহীত হয় এবং এই প্রক্রিয়াটি যে সকল বিষয়ের সঙ্গে সংযুক্ত তা হল, সরকারী উদ্দেশ্য, অর্থাৎ সরকার প্রকৃতপক্ষে কি করতে চাইছে, সরকারের কাজ অর্থাৎ সরকার প্রকৃতপক্ষে কি করছে এবং ঐ কাজের পরিণাম অর্থাৎ সরকারকৃত ঐ কাজের ফলাফল এবং সমাজের উপর তার প্রভাব কি। জননীতি অতঃপর রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার একটি পরিণাম যা ভালো বা খারাপ নীতি গ্রহণ করবার ক্ষেত্রে সরকারের দক্ষতা বিশ্লেষণ করতে সহায়তা করে।

জননীতি প্রক্রিয়ার তিনটি অংশ রয়েছে—

(ক) বর্তমান তথা প্রচলিত অবস্থায় এবং নীতির মূল্যায়ন,

(খ) সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া, যার ভিত্তি হল কার্যকারিতা এবং দক্ষতা,

(গ) সমাজের উপর এই সকল সিদ্ধান্তের প্রভাব বিশ্লেষণ এবং দায়িত্বের ক্ষেত্র নির্ধারণ।

সাধারণ ভাবে, নীতি প্রক্রিয়াটি ভিন্ন পরিস্থিতির সাপেক্ষে উপলব্ধি করতে হলে, চারটি তত্ত্বের উপর নির্ভর করা যেতে পারে—

(i) **Rational actor model বা যৌক্তিক ক্রিয়ক আদর্শ :** এই তত্ত্ব অনুযায়ী জনপছন্দ তত্ত্বের ভিত্তি হিসাবে মানুষের যুক্তিবোধই কাজ করে; এই তত্ত্বে অর্থনৈতিক মানুষের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়, যে মানুষ উপযোগিতার নিরিখে বস্তুগত তৃপ্তির সন্ধানে নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী, সম্পূর্ণ তথ্য লাভ না করলে যুক্তিবোধের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ হয় না।

(ii) **Incremental Model বা প্রান্তিক বৃদ্ধির আদর্শ :** ১৯৫৯ সালে Lindblom তার Science of Muddling through নামক রচনায় প্রান্তিক বৃদ্ধির মাধ্যমে জননীতি গ্রহণের উপর গুরুত্ব দেন। তাঁর ভাবনা অনুসারে, অপর্যাপ্ত তথ্য এবং অপরিণত বোধের ভিত্তিতেও সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে। কারণ সিদ্ধান্ত গ্রহীতারা স্বতন্ত্র বিশ্লেষণ প্রক্রিয়াকে ব্যবহার করে স্পষ্ট লক্ষ্য বা দৃষ্টিকোণ গ্রহণ করবে এমন কোনো কথা নেই।

(iii) **Bureaucratic Organizational Model বা আমলাতান্ত্রিক সংগঠন আদর্শ :** এই ধরনের তাত্ত্বিক অবস্থানে বৃহৎ সংগঠনের পরিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্তের উপর মূল্যায়ন, অনুমান এবং আচরণ বিধির প্রভাব পরিমাপ করা হয়।

(iv) **Belief System Model বা বিশ্বাস নির্ভর ব্যবস্থা আদর্শ :** এই ধারণা অনুযায়ী বিশ্বাস এবং মতাদর্শের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং মনে করা হয় যে, একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্তগুলি সাংগঠনিক রূপ পায় না যা ধারণা এবং মূল্যমান নির্ভর। জননীতি প্রক্রিয়ায় যে আদর্শ বা মডেলকেই ব্যবহার করা হোক না কেন, মূলতঃ যে সকল প্রশ্নের উত্তর খোঁজার প্রচেষ্টা হয়, তা হল—কে, কি পাচ্ছে? কেন পাচ্ছে? এর ফলে রাজনীতিতে কি তারতম্য দেখা যাচ্ছে? বা সরকার কি ধরনের নীতি অনুসরণ করছে বা এ ধরনের নীতির ফলাফল কী?

জননীতির বিশ্লেষণ, অতঃপর 'how of Government' অর্থাৎ কী প্রক্রিয়ায় সরকার নীতি গ্রহণ করছে তার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করে, সরকার কী করছে, তথা নীতির বিষয়বস্তু ও তার পরিণামের তুলনায় প্রক্রিয়াটি অধিক আলোকপ্রাপ্ত হয়। যে সকল চাহিদাগুলি বা পছন্দগুলি কৃত্রিম প্রক্রিয়ায় গ্রন্থিকৃত হয় তার সমষ্টিগত প্রকাশের উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয় এবং মানুষের চাহিদা ও প্রয়োজনের উপর তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, জননীতি প্রক্রিয়াকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হলে নাগরিকের চাহিদার প্রতি সরকার কতটা সংবেদনশীল সেই প্রশ্নের উত্তর যেমন পাওয়া যাবে, তেমনই জনগণের প্রয়োজনের একটি তুল্যমুল্য ক্ষেত্র নির্ধারণ করা যাবে।

৪.১২ নীতি বিশ্লেষণ পাঠের বিকাশ

নীতি সংক্রান্ত পাঠ মানবসভ্যতার প্রাচীন পর্ব থেকেই আনুষ্ঠানিক বা অ-আনুষ্ঠানিকভাবে প্রচলিত; এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ সম্ভবতঃ গীতা, কোরাণ অথবা বাইবেল (Old Testament)-নীতি বিশ্লেষণের আংশিক প্রকাশ এই সকল গ্রন্থে লক্ষ্য করা যায়। Barbara Tuchman তাঁর *The March of Folly* (1984) নামক রচনায় Trojar War

এবং আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের আলোচনা প্রসঙ্গে সমসাময়িক নীতি সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপের উদাহরণ টেনেছিলেন। ম্যাকিয়াভেলির The Prince-এ ঐক্যবদ্ধ ইটালী গঠনের জন্য যে ভাবনার প্রকাশ ঘটেছিল তা জননীতি বিশ্লেষণের একটি জ্বলন্ত উদাহরণ।

রাজনীতির পাঠে বিভিন্ন সময় জননীতি বিশ্লেষণ ব্যক্ত বা সুপ্ত অবস্থায় স্থান পেলেও তা সুসংহত রূপ ধারণ করেছে অনেক পরে। ইতিহাসের পথ পরিক্রমায় রাজনীতির পাঠ বহু আগে থেকে শুরু হলেও সুসংহত জননীতি পাঠের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে বিংশ শতাব্দীতে। Daniel McCool মনে করেন যে, ১৯২২ সালে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী চার্লস মেরিয়ামের হাত ধরে জননীতি পাঠের শুরু, যিনি সরকারের প্রকৃত কার্যবিধির সঙ্গে রাজনীতির তত্ত্ব ও প্রয়োগকে সংযুক্ত করতে সচেষ্ট হন অর্থাৎ ম্যাক্‌কুলের পরিভাষায় জননীতি পর্বের আলোচনার সূচনা করেন।

প্রকৃত অর্থে অবশ্য জননীতি পাঠের সুসংহত আত্মপ্রকাশ ঘটে বিংশ শতকের আমেরিকায়। নীতি পরিবর্তন ও নীতি শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়াদিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার জন্য জননীতি পাঠের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ১৯৫০-এর দশকের প্রারম্ভিক পর্বে নীতি বিজ্ঞানের অন্যতম প্রবক্তারা Lasswell, Daniel Lerner, Myres McDougal এবং Abraham Kaplan। নীতিবিজ্ঞানের সূচনা করেন। এই আন্দোলন আরো শক্তিশালী হয় যখন ১৯৭০ এর দশকে বিভিন্ন জননীতির স্কুল গড়ে ওঠে। সাম্প্রতিককালে জননীতি শাস্ত্রে যাদের প্রভাব বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে তারা হলেন Harold Lasswell, William James, Charles Pierce এবং John Dewey।

জননীতি বিশ্লেষণ জনক্ষেত্রে বহুল প্রচারিত হলেও অন্যান্য সংগঠনে এর গুরুত্ব অপরিসীম। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যুদ্ধের সময় ব্যবস্থা জ্ঞাপক বিশ্লেষণের সাপেক্ষে যেভাবে নীতি বিশ্লেষণ করেন তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

৪.১৩ নীতি বিশ্লেষণ—একটি ধারণাভিত্তিক টীকা

বিভিন্ন নীতি পছন্দের মধ্য থেকে, যুক্তি এবং কৌশলগত মূল্যায়নের পরিপ্রেক্ষিতে প্রান্তিক লাভের ভিত্তিতে নীতি বিশ্লেষণ করা হয়। প্রান্তিক ব্যয় এবং উপকারিতা প্রাপ্তির ভিত্তিতে পছন্দের যে তালিকা প্রস্তুত হয় তা নীতি বিশ্লেষণ হিসাবে পরিচিত। নীতি গ্রহণের সময়ে একটি ভারসাম্য পূর্ণ পছন্দ বা পছন্দক্রম সম্ভাব্য তালিকাগুলির থেকে নির্বাচন করার ভিত্তি হল নীতি বিশ্লেষণ, যা নীতি গঠনে সাহায্য করে। চূড়ান্ত পছন্দ সিদ্ধান্ত হিসাবে চিহ্নিত হয় এবং এর প্রভাব বিশ্লেষণ রাজনীতির বিশ্লেষণের সাপেক্ষে করা হয়ে থাকে।

নীতি প্রক্রিয়া কতগুলি নীতিমানজ্ঞাপক অবস্থাকে অনুধাবন করবার চেষ্টা হয়—যেমন, শিক্ষাক্ষেত্রে আর্থিক সাহায্য ছাত্ররা প্রত্যক্ষভাবে পাবে, না প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হবে। যদি সরকার ছাত্রদের হাতে পৌঁছে দিতে চায়, তবে প্রত্যেক ছাত্রের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে পর্যাপ্ত তথ্য সরকারের কাছে থাকা প্রয়োজন। একটি পরিশুদ্ধ নীতি বিশ্লেষণে প্রান্তিক লাভের বিষয়টি বিবেচনার মধ্যে থাকে। কিন্তু কোনো বিশ্লেষণই পরিপূর্ণভাবে এইরূপে অর্থনৈতিক তথ্য দিতে পারে না। বাজারী সিদ্ধান্ত অতঃপর এই নীতি বিশ্লেষণের ভিত্তি হয়ে থাকে। নীতি বলতে যেহেতু রাষ্ট্র এবং রাজনীতির সাথে সম্পর্কিত বিষয়কে বোঝায়, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এবং রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত সেহেতু নীতি বিশ্লেষণের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত থাকে।

প্রস্তাবিত নীতির পরিণাম আলোচনা ছাড়াও নীতি বিশ্লেষণ অপর যে বিষয়টির উপর আলোকপাত করে তা হল তুলনামূলক বিশ্লেষণে হাতিয়ার ব্যবহার করে কিভাবে বিকল্পনীতি গড়ে তোলা যায়। নীতি বিশ্লেষণের ভিত্তি

এরূপ নয় যে, X এর থেকে Y ভালো কিনা, বরং তার মৌলিক প্রভাব কি, নীতি বিশ্লেষণে তার উপরেই আলোকপাত করা হয়। আরো স্পষ্ট ভাষায় বলতে গেলে বলা যায় যে, বিভিন্ন পরিণামের কথা মাথায় রেখে X-এর থেকে Y আলো ভালো বলে সিদ্ধান্তে না এসে এই বিষয়টি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যবস্থার উপর ছেড়ে দেওয়া ভালো, কারণ এটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার পরিণাম, যা রাজনৈতিক বিশ্লেষণ দাবী করে। এককথায় বলা যায় যে, নীতি বিশ্লেষণ হল এমন একটি যৌক্তিক, কৌশলগত বিশ্লেষণাত্মক ক্রিয়া যেখানে কেন্দ্রীয় প্রশ্ন এটি নয় যে, X ভালো না খারাপ, বরং বিবেচ্য বিষয় হল X-এর প্রান্তিক প্রভাব অথবা Y-এর নিরিখে X-এর প্রভাব। অতঃপর নীতি বিশ্লেষণ হল এমন একটি ক্রিয়া যার তত্ত্বগত অবস্থান প্রান্তিক উপযোগিতার তত্ত্বের উপর নির্ভরশীল।

জননীতি গ্রহণ একটি কনভেয়ার বেল্টের মতো যেখানে মত প্রথম সমস্যা চিহ্নিত হয়, বিকল্প কর্মপ্রক্রিয়াগুলি বিবেচিত হয়, নীতি গৃহিত হয়, সংস্থার কর্মীদের দ্বারা সেই নীতি প্রযুক্ত হয়, নীতি মূল্যায়ন হয়, পরিবর্তিত হয় এবং সাফল্য বা ব্যর্থতার নিরিখে পরিত্যক্ত হয় (Lester and Stewart, 2000, 5)।

জননীতি বিশ্লেষণ প্রক্রিয়াগত ভাবেই গুণগত এবং সংখ্যাগত পদ্ধতি ব্যবহার করে, যেমন case study, survey research, সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ইত্যাদি। সাধারণভাবে যে বিষয়টির উপর জোর দেওয়া হয়, তা হল সমস্যাগুলিতে চিহ্নিত করা এবং মূল্যায়ণ করা। সমস্ত বিকল্পগুলিকে চিহ্নিত করা হতে পারে এবং তার ভিত্তিতে সর্বোৎকৃষ্ট নীতি প্রকল্প সম্বন্ধে সুপারিশ করা হতে পারে।

জননীতি বিশ্লেষণ যে বিষয়টির উপর আলোকপাত করতে সাহায্য করে, তা হল বিভিন্ন নীতিগুলির মধ্যে লক্ষ্য পূরণে কোন নীতি সর্বোৎকৃষ্ট। এই পরিপ্রেক্ষিতে জননীতি বিশ্লেষণকে দুটি ক্ষেত্রে বিভক্ত করা যায় : নীতির বিশ্লেষণ এবং নীতির জন্য বিশ্লেষণ। নীতির বিশ্লেষণ বিশ্লেষণাত্মক, বর্ণনাত্মক, অর্থাৎ নীতিকে ব্যাখ্যা করা এবং তার বিকাশ বর্ণনা করা পর প্রথমোক্ত ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত। নীতির জন্য বিশ্লেষণ পরামর্শমূলক (Prescriptive) অর্থাৎ সেই ধরনের নীতি এবং প্রস্তাব গঠন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত যা পরিণামসাপেক্ষ যেমন, সামাজিক কল্যাণ। আগ্রহ এবং বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য অনুযায়ী বিশ্লেষণের প্রকৃতি নির্ধারিত হয়। নীতি বিশ্লেষণ এবং কর্মসূচীর মূল্যায়ন সম্মিলিতভাবে নীতি পাঠের বিষয় বলে বিবেচিত হয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ যে, নীতির বিশ্লেষণ শিক্ষণ সংক্রান্ত পাঠ, যা গবেষকদের আগ্রহের বিষয়, যার দ্বারা গবেষকগণ একটি নির্দিষ্ট সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে নির্দিষ্ট নীতির প্রভাব এবং উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করে তার গুরুত্ব ক্রমবর্ধমান। বর্ণনাত্মক নীতি বিশ্লেষণ যেখানে নীতি প্রক্রিয়ার বিকাশ নিয়ে আলোচনা করে, পরামর্শমূলক বিশ্লেষণ পক্ষান্তরে নীতিগত প্রস্তাব ও বিকল্পগুলির বিশ্লেষণ করে। নীতি বিশ্লেষণ পদ্ধতিগত দিক থেকে বিভিন্ন ধরনের; গুণগত ও সংখ্যাগত পরিমাপ পদ্ধতি সহ কেস স্টাডি, সার্ভে, সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ প্রভৃতি পদ্ধতির দ্বারা নীতি বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে। সাধারণভাবে সমস্যা চিহ্নিত করা থেকে মূল্যায়ন করার মাধ্যমে নীতি বিশ্লেষিত হয়ে থাকে; এই প্রক্রিয়া বিকল্প নীতিগুলোর বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে সর্বোৎকৃষ্ট নীতিটি নির্বাচনে সাহায্য করে থাকে।

নীতি বিশ্লেষণের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী :

চিত্র-১

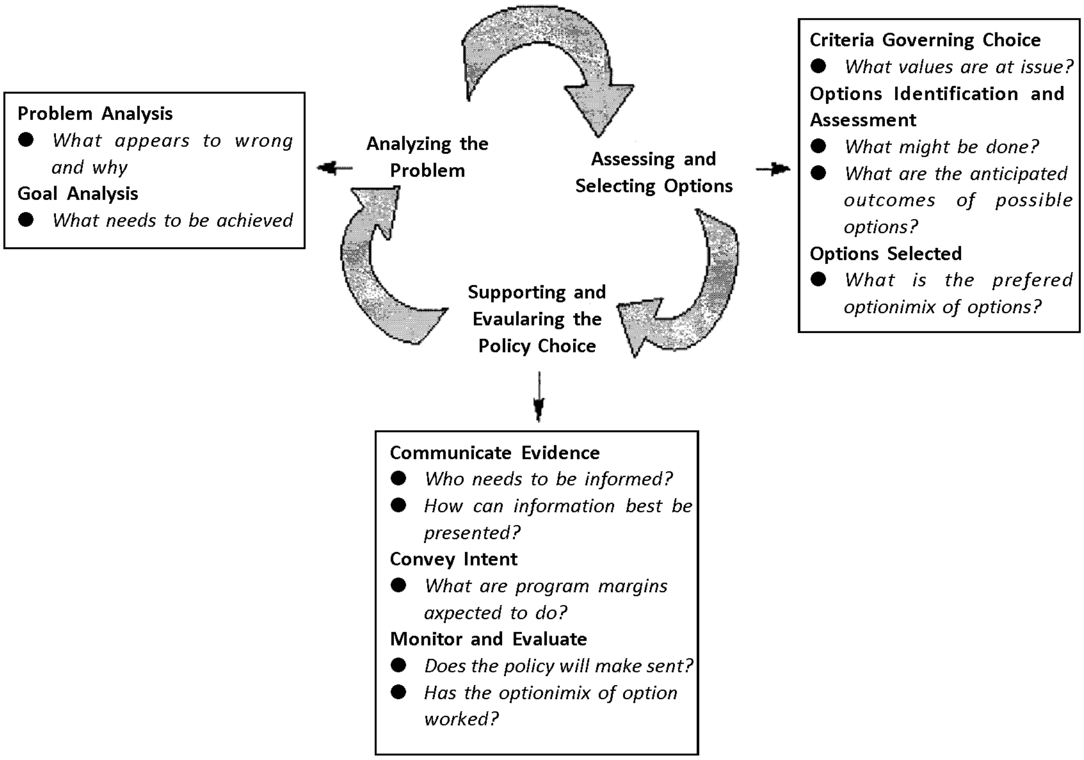

Problem Analysis
- *What appears to wrong and why*

Goal Analysis
- *What needs to be achieved*

Criteria Governing Choice
- *What values are at issue?*

Options Identification and Assessment
- *What might be done?*
- *What are the anticipated outcomes of possible options?*

Options Selected
- *What is the prefered optionimix of options?*

Communicate Evidence
- *Who needs to be informed?*
- *How can information best be presented?*

Convey Intent
- *What are program margins axpected to do?*

Monitor and Evaluate
- *Does the policy will make sent?*
- *Has the optionimix of option worked?*

Analyzing the Problem
Assessing and Selecting Options
Supporting and Evaularing the Policy Choice

চিত্র-২

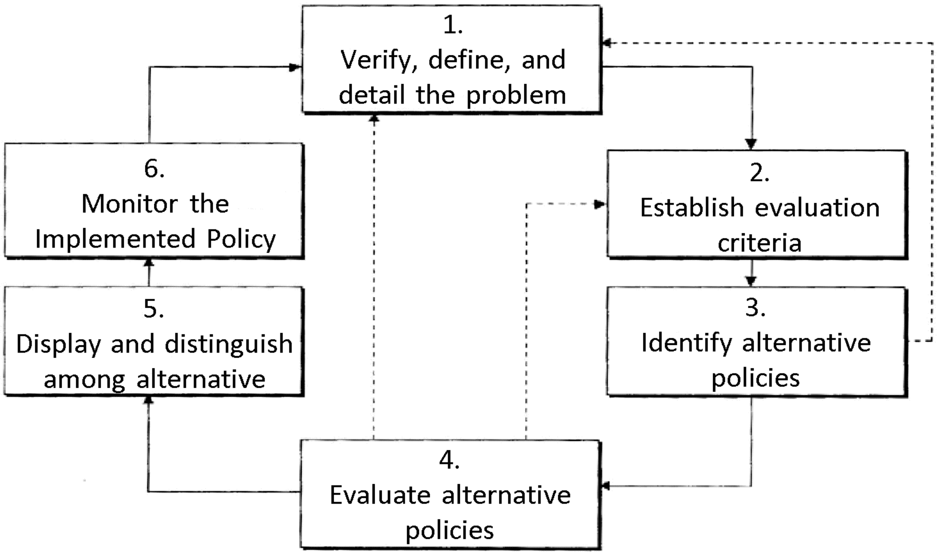

1. Verify, define, and detail the problem
2. Establish evaluation criteria
3. Identify alternative policies
4. Evaluate alternative policies
5. Display and distinguish among alternative
6. Monitor the Implemented Policy

চিত্র-৩

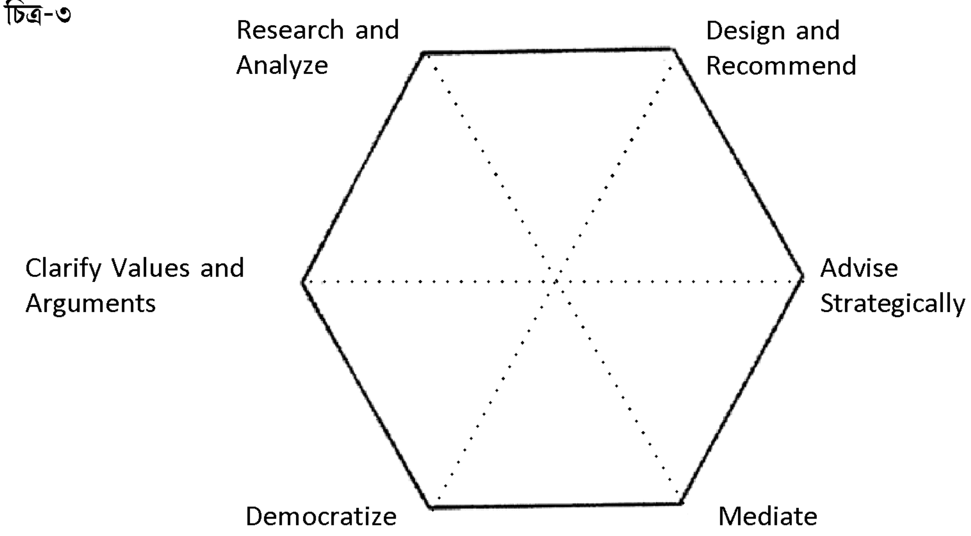

৪.১৩.১ নীতি বিশ্লেষণ অনুধাবনের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি :

প্রশাসনিক গতিশীলতাকে অনুভব করাবার অন্যতম মাধ্যম হল প্রশাসনের প্রায়োগিক দিকের ওপর আলোকপাত করা। পরিস্থিতি, পরিবেশ, জাতীয় স্বার্থ, আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়া অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি, অভ্যন্তরীণ সমাজ ও রাজনীতির চাপ ও চাহিদা প্রভৃতির আলোকে যে জননীতি গৃহীত হয় তাই প্রশাসনে প্রাণ সঞ্চার করে। তথ্যসংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, মূল্যায়ন ও পরিণাম বিশ্লেষণ পর্যন্ত সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি প্রশাসনের প্রধান প্রায়োগিক দিক বলে চিহ্নিত হতে পারে। জননীতি গ্রহণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ, সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণের বিষয়গুলিও প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

নীতি নির্ধারণে রাজনীতিবিদদের একটি বিশেষ ভূমিকা থাকে। রাজনৈতিক ব্যবস্থায় প্রধান দ্বাররক্ষীর ভূমিকা পালন করে জনগণের চাহিদাকে সমর্থনের মাধ্যমে জননীতি প্রক্রিয়ায় সঞ্চালন করে। এই সঞ্চালনা একটি নীতিগত অবস্থানের পরিণাম। এই পরিণামকে ফলাফলে রূপান্তরিত করতে সাহায্য করে থাকে আইনসভা, বিভিন্ন কমিটি, পেশাদারী রাষ্ট্রকৃত্যক, এমনকি চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী বা স্বার্থগোষ্ঠীগুলো। স্বার্থের সংরক্ষণ ও সমন্বয়ের মাধ্যমে এই জননীতি প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার মুখ্য উপাদানগুলো হল—সমস্যা নির্বাচন, বিকল্পের সন্ধান, বিকল্পের মূল্যায়ন, বিকল্পের তুলনা, বিকল্প নির্বাচন, সিদ্ধান্ত প্রণয়ন, সিদ্ধান্ত রূপায়ণ ও প্রয়োগ; এই উপাদানগুলো নিজেদের নির্দিষ্ট কক্ষে প্রবাহিত হয়, জননীতি সংক্রান্ত অবস্থানের ভিত্তিতে। জননীতি হল একটি ধারাবাহিক সামাজিক প্রক্রিয়া, যা নির্দিষ্ট লক্ষ্যের উদ্দেশ্য ধাবিত হয়।

নিয়ন্ত্রক সরকারি নীতি, বন্টনমূলক সরকারি নীতি ও পুনর্বন্টনমূলক সরকারি নীতি গ্রহণের মাধ্যমে সরকার সমাজ, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি গ্রহণের প্রচেষ্টা করে। বাণিজ্যনীতি, শিল্পনীতি বা MRTP, FERA জাতীয় নিয়ন্ত্রণমূলক আইনগুলি নিয়ন্ত্রক সরকারি নীতি বলে পরিচিত হতে পারে। ভূমিসংস্কার, জলবন্টন, বিদ্যুৎ পরিষেবা সংক্রান্ত নীতিগুলি বন্টনমূলক সরকারি নীতি হিসেবে খ্যাত। কর, বাজেট, শ্রমনীতি (বিশেষত মজুরি) সংক্রান্ত সরকারি নীতিগুলিকে পুনর্বন্টমূলক সরকারী নীতি বলা যেতে পারে।

মূলধন গঠনের জন্য কিছু জননীতি তথা সরকারি নীতি গ্রহণ করা হয়। অর্থনৈতিক পনর্গঠনের জন্য বিভিন্ন ধরনের সরকারি নীতি গ্রহণ করা হয়। এই সরকারি নীতি গ্রহণের সময় আন্তর্জাতিক বাজার, অর্থনীতি, বৈদেশিক বাণিজ্যের চাহিদা, দেশীয় অর্থভাণ্ডারের অবস্থা ও ঋণ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা, প্রযুক্তির চাহিদা প্রভৃতি বিষয়কে মাথায় রাখতে হবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে সময়, স্থান ও কাল বিশেযে সরকারি নীতির প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়।

মূলধনের জন্য সরকারি নীতি গৃহীত হয়ে থাকে। শিল্পে বিনিয়োগ, কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ, বিশেষ খাতে কর আরোপ বা মুকুব, ভরতুকির অবলুপ্তি, আমদানি-রপ্তানি নীতির সরলীকরণ, বিদেশি পুঁজি ও প্রযুক্তির আগমনের ক্ষেত্র প্রস্তুত, ব্যাঙ্ক, বীমা, দূরভাষ, পরিবহন, উচ্চশিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে দেশি ও বিদেশি পুঁজিকে স্বাগত জানিয়ে মুক্ত বাজার অর্থনীতির উপযুক্ত প্রতিযোগিতার সূচনা করা প্রভৃতি একবিংশের বিশ্ব বাণিজ্যের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই সরকারি নীতি গৃহীত হয় চলেছে।

সরকারি নীতির সঙ্গে নৈতিক প্রশ্নও জড়িত থাকে। বিশ্ব বাণিজ্যের প্রতিযোগিতামূলক বাজার অর্থনীতির চাহিদা অনুসারে বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য স্বল্প সঞ্চয়ে সুদ হ্রাস করা হলেও সাধারণ মানুষের কথা মনে রেখে সুদের হার নির্ণয় করতে হয়, কারণ সেখানে সরকারের পক্ষে নৈতিক দায় অস্বীকার করা সম্ভব হয় না।

সরকারি নীতি যেমন কর্মসূচির নির্ধারক হতে পারে, তেমনি লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের সংগঠনেও সরকারি নীতি গৃহীত হতে পারে। সরকারি নীতি বিষয়ভিত্তিক হতে পারে, আবার পদ্ধতি নির্ধারকও হতে পারে। উভয় ক্ষেত্রেই লক্ষ্যের সঙ্গে নীতিকে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হয়। বিষয়গত ও পদ্ধতিগত সরকারি নীতি পরস্পরের পরিপূরক।

সরকারি নীতি কীভাবে গৃহীত হয়, তার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ধরনের প্রক্রিয়ার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই প্রক্রিয়াগত তারতম্য ঘটাতে পারে। অভিজাত সরকারি নীতি, অর্থাৎ সমাজের ওপরের অংশের ব্যক্তি বা গোষ্ঠী দ্বারা গৃহীত সরকারি নীতি সমাজের জনগণের ওপর আরোপিত হয়। এই ধরনের সরকারি নীতি স্থিতিশীলতায় বিশ্বাসী। গোষ্ঠীনীতি তথা স্বার্থগোষ্ঠী বা বিভিন্ন ধরনের লবির দ্বারা প্রভাবিত সরকারি নীতি নিয়ন্ত্রণের বা নির্ধারণের কাজ করে। এই ধরণের সরকারি নীতি আইনবিভাগ ও শাসনবিভাগ মাধ্যমে প্রবাহিত হয়। ব্যবস্থাপক সরকারি নীতি তথ্যনির্ভর ও একটি ব্যবস্থার প্রকৃতি নির্ধারণ ও পরিবর্তনের দিক নির্দেশ করে। প্রাতিষ্ঠানিক সরকারি নীতি আনুষ্ঠানিকতার পরিচায়ক। সাংগঠনিক কাঠামো ও কাজ, সরকারি দায়িত্ব ও কর্তব্য, বিভাগীয় কর্মসম্পাদন, জনকৃত্যকের আচরণবিধি সংক্রান্ত সরকারি নীতি এই পর্যায়ভুক্ত। নয়া প্রাতিষ্ঠানিক সরকারি নীতি উপব্যবস্থাকে স্পর্শ করে। নয়া প্রাতিষ্ঠানিক সরকারি নীতিতে বন্টনমূলক, পুনর্বন্টনমূলক ও নিয়ন্ত্রক নীতি গ্রহণের সম্ভাবনা থাকে, তথা ব্যক্তি, মতাদর্শ যেমন নীতির বিষয় হয়, তেমনি নীতিভঙ্গে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা বা প্রয়োজনে সুনাগরিকের জন্য পুরস্কারের ইঙ্গিত বহন করে নয়া প্রাতিষ্ঠানিক সরকারি কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মূল্যের বন্টনও এই প্রক্রিয়ায় বিবেচ্য বিষয়।

৪.১৩.২ নীতি বিশ্লেষণের বিভিন্ন মডেল

নীতি ও লক্ষ্যের মধ্যে সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে কোন বিকল্প নীতিটি সর্বাপেক্ষা কার্যকরী হবে তা নির্ধারণ করার জন্য নীতি বিশ্লেষণ প্রয়োজন হয়। নীতি বিশ্লেষণকে দু'ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করা যেতে পারে—**নীতির বিশ্লেষণ** এবং **নীতির জন্য বিশ্লেষণ**। **নীতির বিশ্লেষণ** বিশ্লেষণাত্মক ও বর্ণনাত্মক। অর্থাৎ এই প্রক্রিয়া নীতি ব্যাখ্যা করে ও তার বিকাশ নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করে। **নীতির জন্য বিশ্লেষণ** নির্দেশকে ভূমিকা পালন করে, যা

নীতি প্রণয়নের পথ দেখায় এবং নীতি সংক্রান্ত প্রস্তাব দেয় (যেমন, সামাজিক কল্যাণ কিভাবে উন্নততর করা যায়)। নীতি বিশ্লেষণের আগ্রহ ও উদ্দেশ্য ঠিক করে যে কোন ধরনের বিশ্লেষণ করা হবে। নীতি বিশ্লেষণ ও প্রকল্প মূল্যায়ন যৌথভাবে নীতি পাঠ হিসেবে বিবেচিত হয়।

নীতির জন্য বিশ্লেষণ নীতি বিকাশের প্রকৃত ধারা নিয়ে গবেষণার ইঙ্গিত দেয়, যা আমলাতন্ত্রের অভ্যন্তরে নীতি রূপায়ণে প্রযুক্ত হয়। **নীতির বিশ্লেষণ** পঠন-পাঠনের সঙ্গে সম্পর্কিত, যা গবেষকদের উদ্বুদ্ধ করে, কিভাবে নির্দিষ্ট সময়ে একটি নীতি বিকশিত হয় ও তার প্রভাব কি, তা বুঝতে।

নীতি বিশ্লেষণ, অতএব, বর্ণনাত্মক বা নির্দেশক হতে পারে। বর্ণনাত্মক নীতি বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া নীতির বিকাশ প্রক্রিয়া বর্ণনা করে। নির্দেশক নীতি বিশ্লেষণ নীতি প্রস্তাব করে এবং বিকল্প নিয়ে আলোচনা করে। নীতিগ্রহণ ও প্রয়োগের পূর্বে নীতি বিশ্লেষণ করলে যে উদ্দেশ্যে নীতি প্রণয়ন করা হয়, তা সফল হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। নীতি বিকাশের বিশ্লেষণ পর্বে প্রস্তাবিত নীতির ত্রুটিগুলো ধরা পড়ে এবং বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর ওপরে এর সম্ভাব্য প্রভাব বোঝা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যে কোনো একটি নীতি সঠিকভাবে সমাজের উপকারিতায় লাগলেও কোনো একটি গোষ্ঠীর উপকারে না লাগতে পারে—এই বিষয়টির তুল্যমুল্য আলোচনাই নীতি বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য। সাধারণভাবে নীতি বিশ্লেষণের তিনটি দৃষ্টিভঙ্গি প্রণিধানযোগ্য—বৈশ্লেষিক দৃষ্টিভঙ্গি, নীতি প্রক্রিয়া ও নীতি রূপান্তর দৃষ্টিভঙ্গি।

বৈশ্লেষিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্তিগত সমস্যা ও তার সমাধানের ওপর আলোকপাত করে; আণবিক পর্যবেক্ষণের পর্যায়ে সমস্যার ব্যাখ্যা প্রদান করে। এই দৃষ্টিভঙ্গি কৌশলগত ভাবনার ধারক। নীতির কৌশলগত অবস্থান ও অর্থনৈতিক গ্রহণযোগ্যতা এই দৃষ্টিভঙ্গির মুল বিষয়বস্তু। যদি দেখা যায় যে অর্থনৈতিক বা কৌশলগত কারণে নীতিটি গ্রহণযোগ্য নয়, তাহলে নীতিটি বাতিল করে বিকল্প নীতির কথা ভাবা হয়।

নীতি প্রক্রিয়াগত দৃষ্টিভঙ্গি রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এবং গ্রাহকদের মতামতকে গ্রহণ করে। আনবিক এককের গন্ডী ছাড়িয়ে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণকে ব্যবহার করে এই দৃষ্টিভঙ্গি সমস্যার ব্যাখ্যা করে। নীতি প্রক্রিয়ায় গ্রাহকদের ভূমিকা ও প্রভাব ব্যাখ্যা করার জন্য প্রক্রিয়া ও উপায়গুলোকে বিশ্লেষণ করা এই দৃষ্টিভঙ্গির উদ্দেশ্য। কিছু গোষ্ঠীর ক্ষমতা ও প্রভাবের আপেক্ষিক পরিবর্তন সমস্যার সমাধান সূত্র নির্ণয়ে সাহায্য করে, যা মূলত রাজনীতিকেন্দ্রীক বলে এই দৃষ্টিভঙ্গি মনে করে। প্রস্তাবিত নীতিটি রাজনীতিতে কতক্ষণ টিকে থাকবে তা বিশ্লেষণ করার কথা বলে এই দৃষ্টিভঙ্গি।

নীতি রূপান্তর দৃষ্টিভঙ্গি একটি ব্যবস্থাপক ও প্রেক্ষিত কেন্দ্রীক দৃষ্টিভঙ্গি। বৃহত্তর এককে এই দৃষ্টিভঙ্গি নীতি বিশ্লেষণের কথা বলে। কি ধরনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক বা সাংস্কৃতিক উপাদান নীতি প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে, অর্থাৎ কি প্রেক্ষাপটে নীতি প্রণীত হয়ে থাকে তার বিশ্লেষণের কথা বলে এই দৃষ্টিভঙ্গি। কাঠামোগত উপাদান সমস্যার ইঙ্গিত দিলে কাঠামোকেই বদলে ফেলা দরকার বলে এই দৃষ্টিভঙ্গি মনে করে। প্রস্তাবিত নীতিতে ক্ষমতার ভারসাম্য আনার ওপর এই দৃষ্টিভঙ্গি আলোকপাত করে; নীতি বিকাশ প্রক্রিয়ায় এই দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষ অবদানের সাক্ষর রাখে। নীতি বিকাশ প্রক্রিয়ায় কাঠামোগত উপাদানগুলো এই দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে।

জননীতি প্রণয়ন ও প্রয়োগ বিশ্লেষণ করার জন্য অনেকগুলো মডেল বিকশিত হয়েছে। এই সকল মডেলগুলো ব্যবহার করে নীতির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে বিশ্লেষকগণ আলোচনা, ব্যাখ্যা ও পুর্বানুমান করে থাকেন।

প্রাতিষ্ঠানিক মডেল (Institutional Model) : এই মডেল সাবেক সরকারি সংগঠনের ওপর আলোকপাত করে এবং বিভিন্ন দপ্তর ও বিভাগের দায়িত্ব ও ব্যবস্থাপনাকে নিয়ে আলোচনা করে। সাংবিধানিক ধারা, প্রশাসনিক ও সাধারণ আইন, বিচারবিভাগীয় সিদ্ধান্ত ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এই মডেল।

সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো জননীতিকে তিনটি বৈশিষ্ট্যের আলোকে অবলোকন করে থাকে—বৈধতা, সার্বজনীনতা এবং বল প্রয়োগ। সাবেক নিয়ম অনুযায়ী প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থানা, বা সরকারি প্রতিষ্ঠানের কাঠামোর মধ্যে সংযোগের ওপর গুরুত্ব দিত না এবং জননীতির বিষয় তেমন গুরুত্ব পেত না। জননীতির ওপরে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার প্রভাব একটি অভিজ্ঞতাবাদী প্রশ্ন। উল্লেখ্য যে, কাঠামো ও নীতি উভয়েই সামাজিক ও অর্থনৈতিক শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়।

নয়া প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গি : ভিন্ন রূপে জননীতির তুলনামূলক বিশ্লেষণের কাঠামো ব্যাখ্যা করতে উদ্যত হয়। প্রাতিষ্ঠানিক উপাদানকে স্বতন্ত্র সত্তায় স্বীকার করে বিভিন্ন দেশের মধ্যে ও বিভিন্ন নীতি এলাকার মধ্যে অথবা বিভিন্ন সময়ের প্রেক্ষিতে জননীতির তুলনামূলক বিশ্লেষণ সাধারণভাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। প্রথমদিকে নয়া প্রাতিষ্ঠানিকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব বা উত্থানের ওপরে আলোকপাত করত, বর্তমানে প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তন এবং বিকাশও আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছে।

প্রক্রিয়া মডেল (Process Model) : নীতি প্রণয়ন এমন একটি প্রক্রিয়া অনুসরণ করে যা কয়েকটি পর্যায় অতিক্রম করে।

- সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং সরকারের কাজের জন্য দাবি;
- আলোচ্য বিষয়সূচী নির্ধারণ;
- বিভিন্ন দল বা গোষ্ঠী কর্তৃক নীতি সংক্রান্ত প্রস্তাব সূত্রবদ্ধকরণ (যেমন, আইন বিভাগীয় কমিটি, চিন্তার ভাঁড়ার সমূহ বা স্বার্থগোষ্ঠী বা রাজনৈতিক দল কর্তৃক প্রস্তাব সূত্রবদ্ধকরণ);
- নীতি নির্বাচন ও আইনে রূপায়ন, যা নীতিকে বৈধতা প্রদান করা বলে অভিহিত হয়;
- নির্বাচিত নীতির প্রয়োগ;
- নীতি মূল্যায়ন।

এই প্রক্রিয়া মডেলটি অবশ্য অতি সরলীকরণ দোষে দুষ্ট বলে সমালোচিত হয়েছে। বাস্তবে নীতি প্রক্রিয়া যে সকল ধাপগুলোকেই পরপর অতিক্রম করবে, তা নাও হতে পারে। এই মডেল বহু উপাদানকে নীতি প্রণয়নের প্রেক্ষাপটে যথাযথ গুরুত্ব দেয় না বা পরিস্থিতির জটিলতাকে যথাযথ গুরুত্ব দেয় না।

জনশাসনকে সরকারি নীতির সাপেক্ষে সংজ্ঞায়িত করার প্রচেষ্টায় প্রথম সমালোচনাটি আসে হারবার্ট সাইমনের বক্তব্য থেকে। তাঁর মতে সরকারি নীতি নয়, সরকারি নীতি প্রণয়নকারীদের আচরণ এবং পদ্ধতিগত দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখে যে কোনো সরকারি নীতিকে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। প্রশাসনিক আচরণবিধি যে কোনো সংগঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণকে প্রভাবিত করে বলে তিনি মনে করেন।

১৯৬০-এর দশকে সাইমন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ৩টি আদর্শকে তুলে ধরেন—

(১) অপরিকল্পিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ (Non-programmed decision making), যার ভিত্তি হল দূরদর্শিতা, বিবেচনা, অন্তর্দৃষ্টি এবং এরকম যুক্তি বহির্ভূত কিছু বিষয়।

(২) বিশুদ্ধ ও সর্বাধিক যুক্তিসম্পন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ (Pure-rationality optimal decision making)

(৩) তৃপ্তিদায়ক সিদ্ধান্ত (Satisficing decision making)

১৯৫৯ সালে Charles Lindblom, নীতি রূপায়ণের দুটি দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করেন। একটি তত্ত্বগত তথা যুক্তিসিদ্ধ সুসংহত দৃষ্টিভঙ্গি (Rational Comprehensive Approach) এবং অপরটি ক্রমোন্নত পর্যায়ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা দরাদরির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ (Incremental steps)।

Rational Comprehensive Approach এর অপর নাম Rational Deductive Models of Decision Making। কোনো সরকারি নীতিকেই চূড়ান্ত যুক্তিসিদ্ধ (absolute rational) বলা যায় না, এ ব্যাপারটা খুব আপেক্ষিক, কারণ সময়, স্থান, কাল, নীতিপ্রণেতা বিশেষ সরকারি নীতি পরিবর্তিত হয়।

যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ (Rational Deductive Models of Decision Making) : আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন তাত্ত্বিক হারবার্ট সাইমন ১৯৪৫ সালে প্রকাশিত তাঁর *Administrative Behaviour* গ্রন্থে সিদ্ধান্ত গ্রহণের যুক্তিসিদ্ধ মডেলের মধ্যে দিয়ে প্রশাসনিক দক্ষতার বিকল্প ব্যাখ্যা প্রদান করেন। সাইমনের মতে, এই যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথমে কোনো এক অবস্থায় প্রশাসক তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশকে বিচার করবেন এবং তাঁর সামনে যে সকল বিকল্প কার্যপদ্ধতি আছে সেগুলির ফলাফল বিচার করবেন এবং যেটি সবচেয়ে তৃপ্তিদায়ক ও যুক্তিসঙ্গত মনে হবে তাই তিনি সিদ্ধান্ত হিসেবে গ্রহণ করবেন। যুক্তিসিদ্ধ মডেল সর্বাধিক সামাজিক লাভ অর্জন করতে চায়।

সাইমনের যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর্যায়গুলি হল—

১. অবস্থা বা পরিবেশের বৌদ্ধিক বিচার : সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার প্রথম পর্যায় হল পরিবেশ বা অবস্থার বিশ্লেষণ পূর্বক তথ্য সংগ্রহ, সম্যক সমস্যা ও সুযোগগুলো চিহ্নিত করে তার যথাযোগ্য বিশ্লেষণ।

২. বিকল্প কর্মপন্থার বিচার : পরিবেশ বা অবস্থার কথা বিবেচনা করে প্রশাসক বিভিন্ন কর্মপন্থা ভেবে দেখবেন এবং প্রত্যেকটি কর্মপন্থা থেকে উদ্ভুত ফলাফল লক্ষ্য করবেন।

৩. প্রত্যেকটি গুণাগুণ বা সুবিধা-অসুবিধা বিচার করতে হবে।

৪. প্রশাসক প্রাসঙ্গিক মূল্যমানের নিরিখে সর্বাধিক পরিতৃপ্তি প্রদানকারী কর্মপন্থাটি গ্রহণ করবেন এবং পরিরাম বিচার করে বিকল্প নীতি বিবেচনা করবেন এবং এটিই হবে তাঁর যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

সাইমনের এই যুক্তিসিদ্ধ সুসংহত পদ্ধতি অনুযায়ী প্রশাসক একটি নীতি সামনে রেখে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই লক্ষ্য নির্ধারিত হয় আপেক্ষিক গুরুত্বের পূর্বাপর অনুসারে।

সাইমনের এই যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত গ্রহণ মডেলও সমালোচনার উর্ধ্বে নয়। সমালোচকদের মতে—

১. যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রাথমিক উপাদান হল প্রাসঙ্গিক তথ্য, অর্থাৎ এটি বিভিন্ন চাহিদা, কী সুবিধা-অসুবিধা বা চাওয়া-পাওয়া এই আপেক্ষিক জিনিসগুলির উপর নির্ভর করে।

২. যুক্তিসিদ্ধ নীতি গ্রহণ ব্যবস্থা অনুযায়ী প্রত্যাশা করা হয় যে নীতি গ্রহীতা সময় বিষয়কে একই সঙ্গে বিবেচনাধীনে রাখবে, যা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় বা বহুজাতিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় সমন্বয়সাধনজনিত সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে।

৩. বিভিন্ন সমস্যা, লক্ষ্য এবং প্রতিশ্রুতির মধ্য থেকে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য গ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে।

৪. ব্যক্তিগত চাহিদা, প্রতিশ্রুতি, দায়বদ্ধতা এবং ভাবনার সীমাবদ্ধতা যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণের অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারে।

৫. প্রত্যেক প্রশাসনিক এককের মধ্যে কিছু দুর্বলতা থাকে, যা কালক্রমে আইনসভা এবং শাসনবিভাগের মধ্যে সম্পর্কের কিছু প্রস্তুতিগত পরিবর্তন ঘটায়। এর ফলে যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পথে বাধা সৃষ্টি হয়।

৬. ব্যক্তিগত প্রশাসকের মনোভাব যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যবস্থাকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে। অতঃপর নীতি গ্রহীতা সর্বোত্তম নয়, তৃপ্তিদায়ক নীতি গ্রহণ করে।

সাইমনের মডেল নিঃসন্দেহে একটি বৈপ্লবিক আবেদনযুক্ত। এই তত্ত্ব জনপ্রশাসনের বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণে সক্ষম। ড্যুইট ওয়ালডো সাইমনের তত্ত্বকে জনপ্রশাসনের ক্ষেত্রে একাধারে বৈপ্লবিক এবং রক্ষণশীল বলে অভিহিত করেছেন।

একইভাবে Wiktorowicz and Deber তাঁদের গবেষণা ‘Regulating biotechnology : a rational politics model of policy development’-এর মাধ্যমে নীতি উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় যুক্তিসিদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গী ব্যবহার করেন। এঁরা যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণে যে পর্যায়গুলির ওপর আলোকপাত করেন তা হল—

(১) তথ্যের সুসংহত সংগঠন ও বিশ্লেষণ,

(২) প্রতিটি বিকল্পের যথাযথ পরিণাম বিচার,

(৩) প্রতিটি সম্ভাব্য পরিণামের বাস্তবতা বিশ্লেষণ,

(৪) প্রতিটি পরিণামে মুল্য বা উপযোগিতা বিচার।

Wiktorowicz and Deber-এর দৃষ্টিভঙ্গি সাইমনের অনুরূপ এবং তাঁরা মনে করেন যে যুক্তিসিদ্ধ মডেল ঘটনা বা তথ্য নির্ভর এবং একমাত্র সর্বশেষ পর্যায়ে এই মডেল মূল্য বিশ্লেষণ করে থাকে।

Patton এবং Sawicki যুক্তিসিদ্ধ মডেলকে নিম্নরূপে বর্ণনা করেছেন—

(১) তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ পূর্বক সমস্যার সংজ্ঞায়ন,

(২) প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো নির্ধারণ করে সিদ্ধান্ত কখন বা কিসের ভিত্তিতে নেওয়া হবে। যাতে সমস্যার যথাসম্ভব সমাধান সম্ভব হয় তার ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ,

(৩) সমস্যা সমাধানকল্পে সম্ভাব্য বিকল্পগুলোর তালিকা নির্মাণ,

(৪) বিকল্পগুলোর পুঙ্কানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে শক্তি ও দুর্বলতা চিহ্নিত করে তুলনামূলক আলোচনা করা এবং সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা,

(৫) প্রতিটি বিকল্পের মূল্যায়ন সাপেক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট বিকল্প নির্বাচন,

(৬) চূড়ান্ত নীতি গ্রহণ করা।

যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্তগ্রহণ মডেল সরকারি বা বেসরকারি ক্ষেত্রে যথেষ্ট কার্যকরী বলে প্রমাণিত হয়েছে। অবশ্য এই মডেল সমালোচনার উর্দ্ধে নয়; অবাস্তব ও অপ্রাসঙ্গিক মডেল হিসেবে এটি সমালোচিত হয়েছে। এই মডেল অত্যন্ত কঠিন, কারণ সামাজিক সমস্যাগুলো যথেষ্ট জটিল ও অস্পষ্ট। রাজনৈতিক ও সামাজিক জটিলতা সমস্যাগুলোর পরস্পর নির্ভরতার সাপেক্ষে এই মডেলের অতি সরলীকরণ অপ্রয়োগযোগ্য ও অবাস্তব।

Thomas Dye যুক্তিসিদ্ধ মডেলকে প্রশংসা করে বলেছেন যে, এই মডেল আধুনিক সমাজের যুক্তি সিদ্ধতার প্রেক্ষিতে একটি উত্তম দৃষ্টিভঙ্গী উপহার দেয়। যুক্তিসিদ্ধ নীতি বিশ্লেষণ সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় কোন বিষয়গুলোকে উপলব্ধির স্তরে আনা উচিৎ, সে সম্বন্ধে একটি ধারণা ব্যক্ত করে। সকল অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত বিষয়াদি যা নীতি বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য অবশ্য বিবেচ্য তা চিহ্নিত করে এই যুক্তিসিদ্ধ নীতি বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, পরিবেশগত নীতি গ্রহণের জন্য যে সকল মাপকাঠিকে বিশ্লেষণ করা হয় তা হল—

- পরিবেশের প্রভাব—যথা, জৈব বৈচিত্র্য, জলের গুণগত মান, বায়ুর গুণগত মান, বসবাসকারী প্রাণী বৈচিত্র ইত্যাদি।
- অর্থনৈতিক দক্ষতা—ব্যয় ও উপাকারিতার তুলমুল্য আলোচনা;
- বন্টনে সমতা—বিভিন্ন জনপরিমণ্ডলে কিভাবে নীতির সুবিধাগুলো বন্টিত হবে এবং জায়গা, গোষ্ঠী, উপার্জন এবং পেশার ভিত্তিতে কিভাবে এগুলো প্রভাব বিস্তার করবে তা বিশ্লেষণ;
- সামাজিক/সাংস্কৃতিক গ্রহণযোগ্যতা—বর্তমান সামাজিক রীতি বা সাংস্কৃতিক মুল্যমানের প্রেক্ষিতে নীতির গ্রহণযোগ্যতা বা বিরোধীতার সম্ভাবনা বিশ্লেষণ;
- প্রয়োগগত বাস্তবতা—নীতি কার্যকরী করার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতার বিশ্লেষণ;
- আইন সিদ্ধতা—প্রচলিত আইনী কাঠামোর সঙ্গে নীতির সামঞ্জস্য বনাম নতুন আইনের প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ;
- অনিশ্চয়তা—নীতির প্রভাব পূর্বাহ্নেই কতদূর পর্যন্ত পরিমাপযোগ্য তা বিশ্লেষণের ওপর নীতি প্রক্রিয়ার সাফল্য নির্ভর করে।

কয়েকটি মাপকাঠি, যেমন অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত, সহজে পরিমাপযোগ্য হলেও, কয়েকটি, যেমন পরিবেশগত বিষয়াদি সহজে অনুধাবনযোগ্য নাও হতে পারে। সিদ্ধান্ত গ্রহণে সকল নীতিগত লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে নীতি বিশ্লেষণ প্রয়োজন; কিন্তু পক্ষান্তরে যদি সহজে অনুধাবনযোগ্য মাপকাঠিগুলোর ওপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়, তাহলে বিশ্লেষণে পক্ষপাতদুষ্টতা অনিবার্য।

যুক্তিসিদ্ধ মডেলকে ওয়েবারিও মডেলও বলা হয়ে থাকে। কারণ জার্মান সমাজতাত্ত্বিক Max Weber জননীতি বিশ্লেষণে যুক্তিসিদ্ধ প্রক্রিয়াকেই ব্যবহার করার কথা বলেছিলেন। যুক্তিসিদ্ধ মডেল বিভিন্ন নীতি বিকল্পের মধ্যে থেকে মোট মুল্যলাভের সাপেক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট নীতিটি বেছে নেয়। যুক্তিসিদ্ধ তত্ত্ব রাজনীতি ও নীতিগ্রহণের ক্ষেত্রে আত্মস্বার্থ সম্পর্কে সতর্ক করে এবং সিদ্ধান্তগ্রহণ সম্বন্ধে একটি উন্নততর ধারণার উপস্থাপনা করে।

গোষ্ঠী মডেল

রাজনীতির গোষ্ঠী তত্ত্ব অনুযায়ী জননীতি হল গোষ্ঠীসংগ্রামের পরিণাম। সমাজে বিভিন্ন ধরনের সংঘাতপূর্ণ স্বার্থের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান ও সমন্বয় সাধন করাই হল একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভূমিকা। রাজনৈতিক জীবনে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘাত ও মিথস্ক্রিয়াকে কেন্দ্র করে গোষ্ঠীতত্ত্ব গড়ে ওঠে। একটি গোষ্ঠী তাদের সাধারণ স্বার্থ ও দৃষ্টিভঙ্গির ওপর ভিত্তি করে অপর গোষ্ঠী থেকে নিজের স্বাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। গোষ্ঠীগুলো যখন সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বা সরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছে নিজেদের দাবিদাওয়া পেশ করে। তখন উক্ত গোষ্ঠীগুলো রাজনৈতিক স্বার্থ গোষ্ঠী বলা হয়। এই সকল গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে যে গোষ্ঠী সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালি হয়, নীতিগ্রহণে তার ভূমিকা থাকে সর্বাধিক। গোষ্ঠীতত্ত্ব অনুযায়ী নীতিগ্রহণ ব্যবস্থাকে নিজের অনুকূলে প্রবাহিত করতে হলে গোষ্ঠীকে সিদ্ধান্ত গ্রহীতার কাছে সাফল্যের সঙ্গে নিজের চাহিদাকে পৌঁছে দিতে হবে। চাপ সৃষ্টি গোষ্ঠীগুলো অনানুষ্ঠানিকভাবে নীতিগ্রহণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করলেও স্বার্থগোষ্ঠীগুলো এই কাজ করে থাকে আনুষ্ঠানিকভাবে। গোষ্ঠীগুলো প্রকট বা প্রচ্ছন্নভাবে সিদ্ধান্ত বা নীতিগ্রহণ ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে, যদিও উল্লেখ্য যে একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠী সবসময়েই প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে না।

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে পদ্ধতিগত দিক থেকে রাজনীতি ও নীতিগ্রহণকে কেবলমাত্র গোষ্ঠীস্বার্থ ও সংঘাতের সাপেক্ষে বিশ্লেষণ করা সঠিক নয়; অন্যান্য অনেকগুলো বিষয়, যেমন মতাদর্শ, ভাবনা বা প্রতিষ্ঠান নীতির বিকাশকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে থাকে।

অভিজাত মডেল

এই মডেলের সার্থকগণ মনে করেন যে সমাজে প্রভাবশালী ও শক্তিশালী ব্যক্তিবর্গের স্বার্থ রক্ষা করেই নীতি রূপায়িত হয়, অর্থাৎ নীতি কখনওই জনগণের চাহিদার প্রতিফলন নয়। নীতিগত প্রশ্নে অভিজাতরা জনগণের মতামতকে প্রভাবিত করে, জনগণের মতামতের আলোকে অভিজাতদের মতামত তৈরি হয় না।

হিংসা, দমন-পীড়ন, জনগণের বিশৃঙ্খল আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে অভিজাতরা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে এবং এরূপ পরিস্থিতির মোকাবিলায় অভিজাত ও জনগণের মধ্যে মতের বিনিময় হয় এবং এরই ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রাধান্যকারী শ্রেণি তথা অভিজাতরা পরিস্থিতি ও পরিবেশকে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা ব্যাখ্যা করে নীতি বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যবস্থাকে নিজেদের স্বার্থ বা মতের অনুকূলে পরিচালিত করে থাকে। দারিদ্র্য, স্বাস্থ্য, বাসস্থান প্রভৃতি বিষয়েতেও অভিজাতরা নিজেদের ভাবনার প্রতিফলন ঘটিয়ে নীতিগ্রহণ ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে।

অভিজাত তত্ত্ব অনুযায়ী, অতঃপর, জননীতি হল শাসকগোষ্ঠীর মূল্যবোধ ও পছন্দের প্রতিফলন।

অধ্যাপক টমাস ডাই এবং হারমন জেগলার অভিজাত তত্ত্বের একটি সারাংশ উপস্থাপিত করেছেন।

(১) সমাজ দুটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত—একটি গোষ্ঠীর হাতে প্রভূত ক্ষমতা ও অপরটি ক্ষমতাহীন।

(২) কতিপয় ব্যক্তি যারা শাসন করেন, তারা শাসিতের মত নয়। সমাজের আর্থসামাজিক স্তরের অসম অবস্থান থেকেই উদ্ভূত হয় অভিজাত গোষ্ঠী।

(৩) যারা অভিজাত নয়, তাদের অভিজাতদের অবস্থানে উত্তোরণ ধীরগতিপ্রাপ্ত হয়, যাতে স্থায়িত্ব বজায় থাকেও বিপ্লব না হয়। অভিজাত ভাবনার সঙ্গে সহমত না হলে এই উত্তোরণ হয় না।

(৪) সামাজিক ব্যবস্থার মৌলিক মূল্যবোধ সম্বন্ধে সহমত পোষণের মাধ্যমে অভিজাতরা প্রচলিত ব্যবস্থাকে রক্ষা করে চলে।

(৫) জননীতি জনগণের চাহিদার নয়, অভিজাতদের মূল্যবোধের প্রতিফলন।

ছয় পর্যায় মডেল

১. সমস্যার পরীক্ষা, সংজ্ঞায়ন ও বিস্তৃতকরণ

২. মুল্যায়নের মাপকাঠি নির্ণয়

৩. বিকল্প নীতি চিহ্নিতকরণ

৪. বিকল্প নীতি মূল্যায়ন

৫. বিকল্প নীতিগুলির প্রকাশ ও পৃথকীকরণ

৬. নীতি প্রয়োগের ওপর নজর প্রদান।

নীচের চিত্রটির সাহায্যে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যায়।

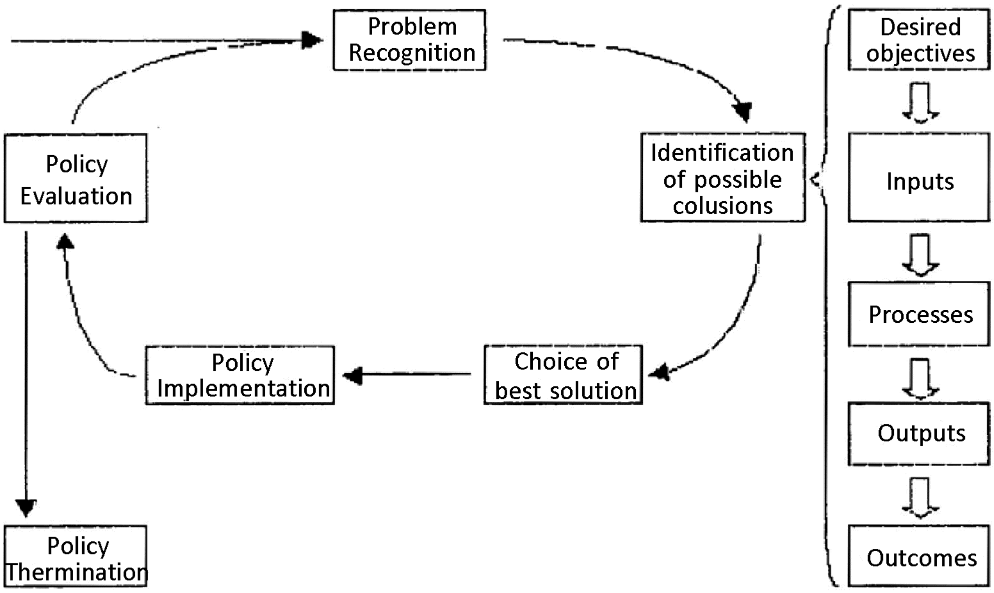
Problem Recognition
Identification of possible colusions
Choice of best solution
Policy Implementation
Policy Evaluation
Policy Thermination
Desired objectives
Inputs
Processes
Outputs
Outcomes

সাধারণভাবে নীতি বিশ্লেষণকে নিম্নের চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়।

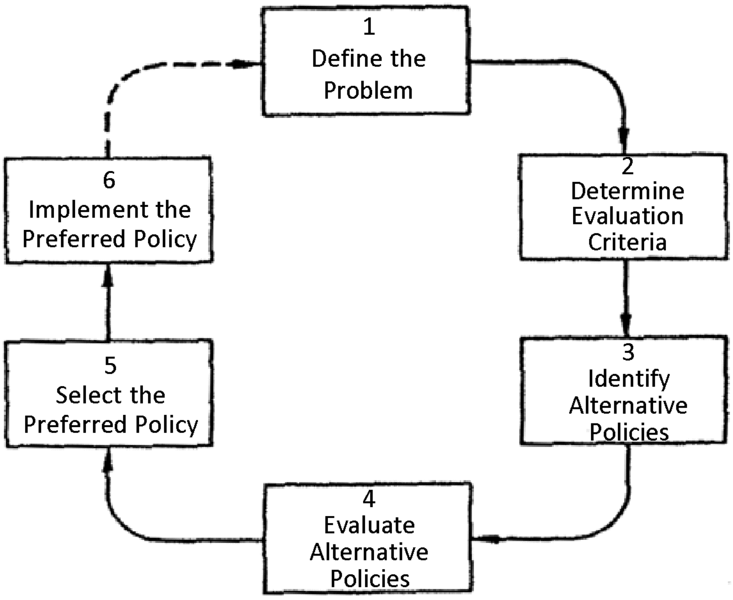
1
Define the Problem
2
Determine Evaluation Criteria
3
Identify Alternative Policies
4
Evaluate Alternative Policies
5
Select the Preferred Policy
6
Implement the Preferred Policy

নীতি বিশ্লেষণ অতঃপর যে সকল বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে তা হল—

(১) নির্দিষ্ট বিষয়কে কেন্দ্র করে একটি সীমিত অনুসন্ধান সংগ্রহ নির্মাণ;

(২) সীমিত বিকল্পের অনুসন্ধান, যা গ্রাহকের মূল্যায়নের জন্য উপস্থাপিত হবে;

(৩) নির্দেশিকা তৈরি, নীতিসংক্রান্ত কাগজ প্রস্তুত ও আইনের খসড়া নির্মাণ;

(৪) একজন নির্দিষ্ট গ্রাহক, তিনি আধিকারিক, নির্বাচিত সদস্য, সরকারি স্বার্থগোষ্ঠী, প্রতিবেশি, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি যাইহোক না কেন, তার একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি আছে, যাকে গুরুত্ব প্রদান;

(৫) সমস্যার অভিমুখের বিকল্প প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা;

(৬) সময় নির্দেশিকা, যা নির্বাচিত জনআধিকারিকদের দরুণ ও অন্যান্য অনিশ্চয়তার কারণে পরিবর্তিত হতে পারে, তা স্মরণে রাখা;

(৭) কাজের সম্পূর্ণতার জন্য একটি রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ;

পর্যায়ক্রমিক বা প্রান্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ (Incremental or marginal and disjointed varieties)

হারবার্ট সাইমন প্রবর্তিত যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণের মডেল প্রশাসনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অসুবিধার সৃষ্টি করে। যে কোনো প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যবস্থা সময় অপচয় এবং সংবাদ সংক্রান্ত বা

নীতিগত বিভিন্ন বাধার সৃষ্টি করে। Charles Lindblom (১৯৫৯)-এর মতে যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ মডেলে ব্যক্তির বুদ্ধিমত্তা এবং তথ্যের উৎস সম্পর্কে যে অনুমান করা হয় তা সত্য নয় এবং সীমিত সময় ও সম্পদের দরুণ যুক্তিসঙ্গত নীতি নির্ধারণ করা সবসময় সম্ভব নয়। এইজন্য Lindblom 'The successive limited comparisons or branch technique'-এর কথা বলেছেন।

Lindblom-এর মতে নীতি রচয়িতারা সর্বদাই গৃহীত কার্যসূচি এবং বাজেট থেকে শুরু করে তার সঙ্গে নতুন কর্মসূচি ও নীতি যোগ করে। সরকারি প্রশাসনের ক্ষেত্রে কার্যত যা হয়, তা হল প্রান্তিক বৃদ্ধি অর্থাৎ কিছু কিছু সংশোধন করে অতীত কার্যাবলীই চলতে থাকে। প্রান্তিক বৃদ্ধির বা Incrementalism-এর ধারণা অনুসারে প্রশাসকেরা ভবিষ্যৎ নীতি নির্বাচনে অতীত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে অগ্রসর হয়।

পর্যায়ক্রমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ (Incrementalism) ক্রমবিবর্তনের মাধ্যম :

সামাজিক পরিবর্তনের কথা বলে। এই পদ্ধতিতে সর্বপ্রকার বিকল্পকে বিবেচনার মধ্যে আনা হয় না। প্রতিষ্ঠিত প্রকল্পগুলির বৈধতাকে স্বীকার করে নিয়ে পূর্ববর্তী মঞ্জুরীকৃত বাজেটে কিছু অর্থ সংযোগ করে ক্রমবিবর্তনের সুপারিশ করে এই পদ্ধতি।

পর্যায়ক্রমিক অথবা প্রান্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের (Incremental or marginal model of decision making) প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে গিয়ে Charles Lindblom বলেন যে, বাস্তবে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ বাবস্থার বে কিছু সমস্যা সৃষ্টি হয় বাস্তবে এই পদ্ধতির গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়; তিনি বলেন যে, প্রান্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতিতে প্রশাসক সর্বোত্তম প্রকল্প গ্রহণের উদ্দেশ্য ধাবিত হন না, বরং কতকগুলো খণ্ডে ক্ষুদ্র পরিবর্তনের দিকে তাকিয়ে পরিবর্তনের কথা ভাবেন। কিছু সীমিত ঘটনা পরম্পরার তুলনামূলক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে সেই মুহূর্তে হাতের কাছে পাওয়া যাবে এমন একটি পছন্দের তালিকা থেকে এমন সমঝোতাপূর্ণ নীতি নেওয়া যেতে পারে, যাতে সমস্ত গোষ্ঠী ও ব্যক্তিরাই সন্তুষ্ট হন। পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তন এই পদ্ধতির লক্ষ্য হওয়ায় সব সময় সিদ্ধান্ত স্থান-কাল নির্বিশেষে একরূপী ও সুসমন্বিত হয় না।

Lindblom-এর মতে, প্রান্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতির দুটি মুখ্য সুবিধা আছে। সিদ্ধান্ত গ্রহীতা ছোটো পর্যায়ে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করেন বলে বড় ভুল বা বৃহৎ মাপের রদবদলের প্রয়োজন হয় না। দ্বিতীয়ত, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় এই পদ্ধতি সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য কারণ এই পদ্ধতি জনসমর্থন ও পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে, যা জনগণের কাছে সহজেই গ্রহণযোগ্য হয়। Lindblom উল্লেখ করেন যে, বিদগ্ধ তাত্ত্বিকরা তাঁর তত্ত্বকে অবৈজ্ঞানিক ও অসঙ্গত বলতে পারেন। একথাও সত্যি যে, এই পদ্ধতি সর্বপ্রকার বিকল্পগুলিকে গুরুত্বের সঙ্গে বিচার করতে অসমর্থ। কিন্তু তাঁর মতে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় এই পদ্ধতি সর্বশ্রেষ্ঠ, কারণ এই পদ্ধতিতে দীর্ঘসূত্রতা নেই বা সুদুর ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে এই পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত বিবেচনা করা হয় না এবং এই পদ্ধতি অত্যন্ত বাস্তবসম্মত। পর্যায়ক্রমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতি সরকারি নীতি গ্রহণের সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃত। অতীতের সঙ্গে যোগসূত্র বজায় রাখা এবং সরকারি নীতি রূপায়ণে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য।

Lindblom প্রান্তিক বৃদ্ধি (Marginal Incrementalism) এবং পক্ষপাতিত্বমূলক পারস্পরিক সমঝোতা

(Partisan mutual adjustment) এই দুই ধারণার সাহায্যে সরকারের প্রকৃত নীতি নির্ধারণের বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন। প্রথমত, এক্ষেত্রে বিশেষ অবস্থায় সরকারি নীতির সীমিত পরিবর্তন ব্যাখ্যা করা হয়।

দ্বিতীয়ত, বিশেষ অবস্থায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সমঝোতার ওপর জোর দেওয়া হয় Lindblom-এর এই মডেলে বিভিন্ন সংঘাতপূর্ণ স্বার্থ ও প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রান্তিক সমন্বয়হীন সমঝোতা হিসেবে নীতি নির্ধারণ বা সিদ্ধান্ত গ্রহণকে দেখা যায়। আর এই কারণেই এটি বিচ্ছিন্নতাপূর্ণ বৃদ্ধির রূপ গ্রহণ করে।

Lindblom-এর এই প্রান্তিক বৃদ্ধির ধারণা সাইমনের যুক্তিসঙ্গত মডেলের সম্পূর্ণ বিপরীত। এই প্রান্তিক বৃদ্ধির ধারণার সমালোচনা করে ড্রর (Dror) বলেছেন নতুন পরিস্থিতিতে উত্তম নীতি নির্ধারণের কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই এবং প্রান্তিক বৃদ্ধির ধারণা মূলত স্থিতিশীলমুখী। যখন অতীত নীতির ফলাফল অসন্তোষজনক হয়ে পড়ে, তখন এই মডেল ভবিষ্যৎ গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো কাজে লাগে না। কারণ প্রান্তিক পরিবর্তন ঘটিয়ে ভবিষ্যতে কোনো উত্তম ফলালাভ করা যায় না।

সরকার বহুমুখী উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে এই পদ্ধতি যথেষ্ট উপযুক্ত নয়। কারণ এই পদ্ধতি স্থিতিশীলতায় বিশ্বাসী। এই পদ্ধতি যেভাবে ক্রমান্বয়ে বিকাশের কথা বলে, তা কখনই দ্রুত পরিবর্তনের অনুকূল হতে পারে না।

সংশ্লেষক পদ্ধতিতে জননীতি গ্রহণ (Mixed Scanning)

এৎশিয়নি ‘Mixed Scanning’ তথা মিশ্র পদ্ধতির কথা বলেন। তিনি যুক্তিসিদ্ধ অবরোহণ পদ্ধতিকে সমালোচনা করলেও পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তনমূলক পদ্ধতিকেও সমর্থন করেননি। এই পদ্ধতি একপেশে এবং উদ্ভাবনী শক্তিবিহীন; এটি সমাজে প্রতিষ্ঠিত, সংগঠিত এবং ক্ষমতাবানদের স্বার্থ সংরক্ষণে উৎসাহিত করে। এই পদ্ধতি কতকগুলি মৌলিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে অকার্যকারী, যেমন—যুদ্ধ ঘোষণা। সেই কারণে এৎশিয়নি উক্ত দুই পদ্ধতির সংমিশ্রণে Mixed Scanning-এর কথা বলেন। এৎশিয়নি সংগঠনকে ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের আধারে বিশ্লেষণ করেছেন; তাঁর মতে, কোনো সংগঠন কী ধরনের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব ব্যবহার করে, তার ওপর তার প্রকৃতি নির্ভর করে। তিনি তাঁর পদ্ধতিটিকে ব্যাখ্যা করেন একটি অসাধারণ উদাহরণের সাহায্যে, ধরা যাক বিশ্বব্যাপী আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ করা হবে। যুক্তিসিদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী সম্পূর্ণ আকাশের পুঙ্খানুপুঙ্খ ছবি গ্রহণের জন্য বহু ক্যামেরা ব্যবহৃত হবে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ হবে, এর ফলে বিশদ বিবরণ হয়তো পাওয়া যাবে, কিন্তু তা হবে অত্যন্ত খরচ সাপেক্ষ, যা কর্মক্ষমতার সীমারেখা অতিক্রম করতে পারে। পর্যায়ক্রমিক বিবর্তন পদ্ধতির সমর্থকরা সাম্প্রতিক অতীতে যেসকল স্থানে একই ধরনের আবহাওয়া লক্ষ করা গেছে, সেগুলির ওপর এবং পার্শ্ববর্তী কিছু অঞ্চলের ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। এর ফলে কিছু অপ্রত্যাশিত আবহাওয়া বৈচিত্র্য বিশ্লেষিত নাও হতে পারে। পদ্ধতির সমর্থকেরা এই দুটি দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়ের কৌশল অবলম্বন করেন। তাঁরা দুটি ক্যামেরা ব্যবহার করবেন, একটি সমস্ত আকাশের ছবি তুললেও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অংশগুলিকে বিশ্লেষণের মধ্যে যাবেন না এবং দ্বিতীয় ক্যামেরাটি প্রথম ক্যামেরা থেকে প্রাপ্ত ছবির বিশ্লেষণের মাধ্যমে যে সকল অঞ্চলে কিছু বৈচিত্র্য বা অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করা গেছে, সেই সকল অঞ্চলের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ছবি গ্রহণ করবে। এৎশিয়নি-র মতে, Mixed Scanning পদ্ধতিতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোনো একটি বিশেষ ঘটনা নজরে না আসতে পারে, তবে তুলনায় সেই সমস্যা অনেক কম।

৪.১৪ উপসংহার

জননীতি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়, যা নীতিটিকে বৈধতা প্রদান করে। সরকার কর্তৃক গৃহীত নীতি সকল নাগরিকের ওপর প্রযোজ্য এবং সরকার নীতি প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনে শক্তি ব্যবহার করে থাকেন। সরকারের আইনবিভাগ, শাসনবিভাগ ও বিচারবিভাগ নীতিকে বৈধতা দেয়। সরকারি নীতির বিশ্লেষণে অনেক অনিশ্চয়তা দেখা সিদ্ধান্তগ্রহণ ও পরিবেশের প্রতিফলনের মধ্যে জটিল সম্পর্ক নীতি বিশ্লেষণে অবশ্য প্রণিধানযোগ্য।

জননীতি সম্বন্ধে পাঠ জনগণের সমস্যার সমাধানকল্পে রচিত; অতঃপর বর্তমান ও আশু সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে নীতি সংক্রান্ত সামাজিক গবেষণাই প্রাসঙ্গিক। অন্যভাবে নীতি সংক্রান্ত আলোচনার উদ্দেশ্য হল সরকারি ও সামাজিক কার্যপ্রক্রিয়ার জন্য প্রস্তাব বহন করা। ইস্টনের উত্তর আচরণবাদ। লিণ্ডব্রথের বিযুক্ত প্রান্তিক বৃদ্ধির মতবাদ এবং ড্র'রের নীতি সংক্রান্ত মতবাদ নীতিগ্রহণের বর্তমান অভিমুখের ওপর আলোকপাত করে থাকে।

নীতি বিশ্লেষণের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি বর্তমান। সমাজবিজ্ঞান ও শিক্ষানীতির পাঠে নীতির বিশ্লেষণ ও নীতির জন্য বিশ্লেষণকে কেন্দ্র করে নীতি বিশ্লেষণের দৃষ্টিভঙ্গিটি গড়ে ওঠে। যা ক্রমান্বয়ে সংযুক্ত হয় নীতি বিশ্লেষণ ও গবেষণা কাঠামোর বিভিন্ন ধারার সঙ্গে।

নীতি বিশ্লেষণ, নীতি গঠন, নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা নীতি রূপায়ণ এবং রাজনৈতিক বিশ্লেষণের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য লক্ষণীয়। সাধারণভাবে এই কাজগুলোকে নীতি প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায় বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। কিন্তু এই ভাবনা যথার্থ নয়, কারণ এইভাবে পার্থক্য নিরূপণ সম্ভব নয় এবং এই কাজগুলো কোনো নির্দিষ্ট ক্রমে সংঘটিত হয় না। তবে প্রতিটি কাজই আপন বৃত্তে স্বতন্ত্র ও নিজস্ব তত্ত্বের দ্বারা সমর্থিত।

জননীতি একটি কলা ও কারিগরী বিদ্যাপ্রসূত। এটিকে কলা বলা হয়। কারণ জননীতিও দুরদৃষ্টি অভিজ্ঞতা, সৃজনশীলতা ও কল্পনা নির্ভর। এটি কারিগরী বিদ্যার দ্বারা সমৃদ্ধ কারণ জননীতি রূপায়ণেও অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, জনপ্রশাসনের জ্ঞান আবশ্যক। সাবেক পাঠ্যশাস্ত্রের প্রয়োগগত উপভাগ হল জননীতি। জনগণের সমস্যার সমাধানে কোনো নিখুঁত, বিশুদ্ধ ও চিরস্থায়ী সমাধান হয় না; জননীতিও সৃষ্টিশীলতার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে সময়োপযোগী হয়ে ওঠে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষণ : নীতি বিশ্লেষণ যেখানে একটি কমধারার লাভ-ক্ষতি নির্ণয় করে, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ, পক্ষান্তরে, রাজনৈতিক লাভের হিসেব কষে। নির্বাচকমণ্ডলী বা নির্বাচনী এলাকা রাজনৈতিক বিশ্লেষণে যতটা গুরুত্ব পায়, মোট সামাজিক উপকারিতা তা মোটেই পায় না। জনগণের মঙ্গল নীতি বিশ্লেষণে যতটা গুরুত্ব পায়, রাজনৈতিক বিশ্লেষণে তা পায় না, বরং ভোটই এক্ষেত্রে প্রধান বিবেচ্য বিষয় হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক বিশ্লেষণের তত্ত্ব প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক আচরণ বিশ্লেষণের তত্ত্ব।

- নীতি বিশ্লেষণ তত্ত্ব হল প্রান্তিক উপযোগিতার তত্ত্ব।
- নীতি রূপায়ণের তত্ত্ব হল আন্তঃসংস্থা রাজনীতির তত্ত্ব।
- নীতিভিত্তিক সিদ্ধান্তের তত্ত্ব হল রাষ্ট্রতত্ত্বের প্রতিফলন, যা কর্তৃত্বকে তুলে ধরে।
- অন্তিমে, রাজনৈতিক বিশ্লেষণের তত্ত্ব হল রাজনৈতিক আচরণ তত্ত্ব।

এই সকল কার্যকলাপ একযোগে জননীতি প্রণয়ন, রূপায়ণ ও প্রয়োগকে একটি আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে কার্যকরী রূপ প্রদান করে।

৪.১৫ সারাংশ

জননীতি সম্বন্ধে পাঠ ও নীতি বিশ্লেষণ সম্বন্ধে পাঠ রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং জনপ্রশাসনের একটি প্রতিষ্ঠিত অংশ। জননীতি হল সরকার কর্তৃক গৃহীত কর্মধারা। সরকার কর্তৃক স্বীকৃত সমস্যার সমাধানকল্পে সরকারি ক্রীয়করা যে লক্ষ্যনির্ভর কর্মধারা নির্বাচন করে, তাই জননীতি বলে পরিচিত। জননীতি হল একটি প্রক্রিয়া যা বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে প্রতিষ্ঠিত ও প্রযুক্ত হয়। জননীতি প্রক্রিয়া কয়েকটি বিশ্লেষণের ধাপ অতিক্রম করে। ১৯৬০-এর দশক থেকে জননীতি বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার নবরূপায়ণ ঘটেছে, যা বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে।

৪.১৬ পাঠ সমাপ্তি প্রশ্নাবলী

(ক) দীর্ঘ প্রশ্নাবলী :

(১) নীতির লক্ষ্য কী কী? জননীতি বিশ্লেষণের প্রধান দৃষ্টিকোণগুলো কী?

(২) জননীতি বিশ্লেষণ বলতে কি বোঝায়? কিভাবে এই বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া বাস্তবে চলে? সিদ্ধান্ত কি সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে গৃহীত হয়, নাকি রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে?

(৩) রাজনৈতিক জগতে নীতিবিশ্লেষণের তাৎপর্যটিকে সমালোচনাসহ আলোচনা করুন।

(৪) নীতি বিশ্লেষণের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে একটি টীকা রচনা করুন।

(৫) নীতি বিশ্লেষণের মডেলগুলো ব্যাখ্যা করুন।

(৬) রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এবং নীতি বিশ্লেষণের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করুন এবং তাদের সম্পর্কের ওপর আলোকপাত করুন।

(খ) মাঝারি প্রশ্নাবলী :

(১) নীতি বিশ্লেষণের যুক্তিসিদ্ধ মডেলের মৌলিক অনুমান ও উপাদানগুলোর ওপর আলোকপাত করুন।

(২) কোনো ব্যক্তির জন্যই একটি নির্দিষ্ট মডেল বা দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে রক্ষণশীল মনোভাব দেখানো সঠিক নয়—পর্যালোচনা করুন ও মন্তব্য করুন।

(৩) নীতি প্রক্রিয়া কিভাবে বাদ করে?

(গ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী :

(১) নীতিবিশ্লেষণের প্রাতিষ্ঠানিক মডেল চিহ্নিত করুন।

(২) টীকা লিখুন :

(ক) যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ,

(খ) নীতি বিশ্লেষণের অভিজাত মডেল।

(৩) সংশ্লেষ পদ্ধতিতে জননীতি গ্রহণ বলতে কি বোঝেন?

৪.১৭ গ্রন্থসূচী

Dahl, R., *Who Governs*? New Haven, Yale University Press, 1961.

Dunn, William, *Public Policy Analysis: An Introduction*, NJ, Prentice Hall, 2003.

Dye, Thomas R., *Understanding Public Policy* (12th ed.), NJ, Prentice Hall, 2007

Ian, Thomas, ed., *Environmental Policy: Australian Practice in the Context of Theory*. Sydney: Federation Press, 2007

Lester and Stewart, Techniques to Investigate a Depressed Employee, Ottawa: Self-Published, 2000... Canada and Immigration: Public Policy and Public Concern, Second Edition, ...2000

Mccool, Daniel, *Public Policy Theories, Models, and Concepts: An Anthology*, NJ, Prentice Hall, 1995

Woodhouse, J.E & Lindblom, C.E., *Policy Making Process*, 3rd Edition. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1992

৪.১৮ নির্বাচিত পাঠ

ঘোষ, সোমা, *জনপ্রশাসন-তত্ত্ব ও প্রয়োগ*, কলকাতা, প্রগ্রেসিভ প্রকাশনা, ২০১০।

বসু রাজশ্রী, *জনপ্রশাসন*, কলকাতা, রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০০৫।

সোম, সুভাষ, *জনপ্রশাসন*।

বসু, রুমকী ও চট্টোপাধ্যায়, পঞ্চানন, *জনপ্রশাসন*।

চক্রবর্তী, দেবাশীষ, *গণপরিচালন*।